অদৃশ্য মানুষ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অদৃশ্য মানুষ (উপন্যাস)

প্রথম। অপরিচিত আগন্তুকের আগমন

একটি ছোটখাটো শহর। তার আসল নামটি বলব না। ধরে নাও তার নাম হচ্ছে শ্রীপুর। ছুটির সময়ে নানান দেশ থেকে সেখানে অনেক লোক বেড়াতে আসে। কারণ জায়গাটির জল হাওয়া নাকি ভালো।

পাহাড়ে-শহর। পথে-ঘাটে বেরুলেই আশেপাশে ছোট-বড় পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ে শহরে তখন পাহাড়ে-শীত। মাঝে মাঝে বরফও পড়ে।

বৈকাল। শ্রীপুর শহরে যখন রেলগাড়ি এসে থামল, চারিদিকে তখন কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। সে হাওয়া গায়ে যেন ছুরির ফলার মতন বিধে যায়। বোধ হয় বরফ পড়তে আর দেরি নেই।

একজন যাত্রী ইস্টিশানে এসে নামল। যাত্রীটি জাতে বাঙালি, সেটা তার পরনের কাপড় দেখলেই বোঝা যায়। তার পায়ে ঘোড়তোলা জুতো ও ফুল-মোজা। গায়ের জামা দেখবার জো নেই, কারণ একখানি আলোয়ানে সে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। কেবল তার ডান হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল, সেই হাতে ঝুলছিল একটা পোর্টম্যান্টো। তার হাতও ছিল দস্তানা-পরা। আলোয়ানের উপর জেগে আছে তার অদ্ভুত মুখখানা–সে-মুখের সবটাই ব্যান্ডেজে একেবারে ঢাকা। সাদা ব্যান্ডেজের ভিতর থেকে জেগে আছে কেবল তার গোঁফদাড়ি আর নাকের ডগাটা। তুলি-চশমা, অর্থাৎ গ দিয়ে সে তার চোখ দুটো পর্যন্ত সকলকার চোখের আড়াল করে রেখেছে। এই রহস্যময় লোকটি যে কে তা আমরা জানি না। এবং যতদিন না তার নাম জানতে পারি ততদিন। পর্যন্ত তাকে আমরা যাত্রী বলেই ডাকব।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে ইস্টিশানের বাইরে এসে যাত্রী একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল। খানিক দূর অগ্রসর হয়েই একখানা দোতলা বাড়ির সামনে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাড়িখানার দোতলার বারান্দায় একখানা সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে–শ্রীপুর স্বাস্থ্যনিবাস। অল্পক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রী বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

এই স্বাস্থ্যনিবাসটির একটুখানি পরিচয় দরকার। শ্রীপুরে যারা বেড়াতে আসে তাদের অনেকেই এই স্বাস্থ্যনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর মালিক হচ্ছেন মিস্টার দাস ও মিসেস দাস। তারা বাঙালি খ্রিস্টান। স্বাস্থ্যের খোঁজে যাঁরা এখানে এসে ওঠেন তারা দুজনেই তাদের যত্ন, সেবা ও আদর-আপ্যায়নের ভার নেন–অবশ্য কয়েকটি রূপোর টাকার বিনিময়ে। তারাও এই বাড়ির অন্য এক মহলে বাস করেন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকেই একটি বড় হলঘর। সেটি হচ্ছে এখানকার সাধারণ বৈঠকখানা। মিস্টার ও মিসেস দাস প্রত্যহ এইখানে বসেই তাদের অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজব ও আলাপ পরিচয় করেন।

আমাদের যাত্রীটি এই ঘরে ঢুকেই গম্ভীর স্বরে বললেন, আমার একখানা ভালো ঘর চাই!

মিসেস দাস তখন তার কয়েকজন অতিথির সঙ্গে একমনে গল্প করছিলেন। যাত্রীর আকস্মিক প্রবেশে ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ঘরের সকলেই চমকে উঠল। যাত্রী তার দস্তানা-পরা হাত দিয়ে একখানা একশো টাকার নোট বার করে আবার গম্ভীর স্বরে বললে, এই নিন আগাম টাকা! আমার একখানা ভালো ঘর চাই।

না চাইতেই আগাম একশো টাকা! বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মিসেস দাসের প্রাণটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! কপাল না খুললে এমন অতিথি মেলে না!

মিসেস দাস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, আসুন আমার সঙ্গে! আপনাকে বাড়ির সেরা ঘরই ছেড়ে দেব!

মিসেস দাস যাত্রীকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাড়ির দোতলায় রাস্তার ধারের বড় ঘরখানিই যাত্রীর জন্যে ছেড়ে দেওয়া হল। যাত্রী সেই ঘরের ভিতরে ঢুকে পোর্ট ম্যান্টোটি একটি টেবিলের উপরে রেখে দিলেন।

মিসেস দাস তার নতুন অতিথিটির সঙ্গে ভালো করে আলাপ জমাবার চেষ্টায় বললেন, আপনি বুঝি বৈকালের ট্রেনে এখানে এসেছেন?

যাত্রী জবাব না দিয়ে মিসেস দাসের দিকে পিছন ফিরে রাস্তার দিকে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়াল। তারপর মুখ না ফিরিয়েই বললে, আমার খিদে পেয়েছে। এখুনি কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন।

আলাপটি ভালো করে জমল না বলে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে মিসেস দাস অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পনেরো পরে চাকরের সঙ্গে মিসেস দাস আবার ভিতরে এসে ঢুকলেন। যাত্রীকে শুনিয়ে চাকরকে ডেকে বললেন, ভিখ, টেবিলের উপরে খাবারের থালা রাখ!

যাত্রী ঠিক আগেকার মতোই পাথরের মূর্তির মতন জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। এবং এবারেও মুখ না ফিরিয়েই বললে, আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন!

মিসেস দাস নিজের মনে-মনেই বললেন, লোকটার টাকা আছে, কিন্তু ভদ্রতা-জ্ঞান মোটেই নেই! প্রকাশ্যে বললেন, আপনি চা খান কি?

যাত্রী বললে, মিনিট পনেরো পরে পাঠিয়ে দেবেন।

মিসেস দাস ঘরের ভিতরে আর দাঁড়ালেন না।

মিনিট পনেরো পরে ভিখুর সঙ্গে মিসেস দাস আবার ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলেন, যাত্রী জানলাগুলো বন্ধ করে আধা-অন্ধকারে কোণের দিকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে

বসে আছে। টেবিলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার জলখাবার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। বললেন, আপনার চা নিয়ে এসেছি।

যাত্রী বললে, চা রেখে যান।

ভিখু চায়ের সরঞ্জাম রেখে টেবিল থেকে জলখাবারের থালাগুলো সরাতে লাগল; মিসেস দাস সেই ফাঁকে যাত্রীকে আর-একটু ভালো করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভালো করে কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না। যাত্রী তখনও তার মুখের ব্যান্ডেজ তো খোলেইনি, উপরন্তু গায়ের আলোয়ান, হাতের দস্তানা ও পায়ের জুতো-মোজা পর্যন্ত ঠিক সেই ভাবেই পরে আছে। কেবল নিজের ঠোঁটের কাছ থেকে ব্যান্ডেজটি একটুখানি টেনে নামিয়ে রেখেছে-বোধহয় খাবার সুবিধার জন্যে। কিন্তু তার নাকের তলার দিকে চেয়ে মিসেস দাস ঠোঁটের কোনও চিহ্নই দেখতে পেলেন না! তিনি ভাবলেন, আধা-অন্ধকারে বোধ হয় তার চোখের ভ্রম হচ্ছে। তবু তার মনটা কেমন এক অস্বাভাবিক ভয়ে ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল। এ কীরকম রহস্যময় লোক। এ যেন মানুষের চোখের সামনে আসতে চায় না–সর্বদাই নিজেকে সাবধানে লুকিয়ে রাখতে চায়। পৃথিবীর আলো-হাওয়াকে এ যেন পরম শত্রু বলে মনে করে! কে এ! ওর সারা মুখখানায় ও কীসের ব্যান্ডেজ? কোনও দৈবদুর্ঘটনায় ওর মুখখানা কি ভীষণ ভাবে জখম হয়েছে? না, কোনও সাংঘাতিক অস্ত্র-চিকিৎসায় ওর মুখের অবস্থা অমনধারা হয়েছে?

মিসেস দাস মনে মনে এমনই সব কথা নিয়ে ভোলা-পাড়া করছেন, এমন সময় যাত্রী হঠাৎ বললে, ইস্টিশানে আমার কতকগুলো লগেজ পড়ে আছে। সেগুলো আবার কি উপায় করা যায় বলুন দেখি?

যাত্রীর গলার আওয়াজ আর তেমন কর্কশ নয়। মিসেস দাস ভাবলেন, তার স্বাস্থ্যনিবাসের সুখাদ্য খেয়ে তার মেজাজ নরম হয়ে গিয়েছে! যাহোক, কথা-কইতে-নারাজ যাত্রীর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেয়ে মিসেস দাস খুব খুশি হয়ে, বললেন, সেজন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব অখন।

যাত্রী বললে, আজকেই সে ব্যবস্থা হতে পারে কি?

মিসেস দাস মাথা নেড়ে বললেন, আজ আর হয় না। মিস্টার দাস তার এক বন্ধুকে দেখতে গেছেন, কখন ফিরবেন বলা যায় না। বুঝলেন মশাই? তাঁর বন্ধুটি ট্রেন থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়ে বসে আছেন!–এই বলে যাত্রীর ব্যান্ডেজ-করা মুখের দিকে একবার কৌতূহলী। দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার শুরু করলেন, আজকাল পথে-ঘাটে দৈব দুর্ঘটনা বড় বেশি বেড়ে গেছে, না মশাই?

মিসেস দাসের ইচ্ছা যে, যাত্রী নিজের মুখেই প্রকাশ করে তার মুখে ও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা কেন? কিন্তু যাত্রী সে ধারও মাড়ালে না, হঠাৎ গলার আওয়াজ বদলে বলে উঠল, আচ্ছা, আমার লগেজ কাল এলেই চলবে। এখন আমি একটু একা থাকতে চাই।

আমার সঙ্গে গল্প করতে রাজি নয়, এ কীরকম অসভ্য লোক?

সবিস্ময়ে এই কথা ভাবতে ভাবতে অত্যন্ত অভিমান-ভরে মিসেস দাস সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস দাস একেবারে নীচের বৈঠকখানায় গিয়ে ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন। ঠিক বৈঠকখানার উপরেই ছিল যাত্রীর ঘর। সে যে নিজের মনে ঘরের ভিতরে পায়চারি করছে, তারই আওয়াজ মিসেস দাসের কানের ভিতর এসে ঢুকল।

.

দ্বিতীয়। রতনবাবুর সন্দেহ

খানিক পরে মিস্টার দাসের এক বন্ধু সেই বৈঠকখানার এসে হাজির হলেন। তার নাম রামরতন–কিন্তু সবাই তাকে ডাকে রতনবাবু বলে। তিনি মাঝে মাঝে এখানে তার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে গল্প করতে আসেন এবং সেই সময়ে দু-একখানা টোস্ট ও এক পেয়ালা চা পেলেই খুব খুশি হয়ে সদ্ব্যবহার করে যান। স্বামীর বন্ধুদের জন্যে এরকম বাজে-খরচ

হওয়া মিসেস দাস মোটেই পছন্দ করেন না। বলেন, আমাদের স্বাস্থ্যনিবাস ব্যবসার জায়গা দাঁতব্য ভোজনালয় নয়, তুমি তোমার বন্ধুদের সাবধান করে দিও। মিস্টার দাস তার স্ত্রীর এই হুকুম পালন করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু রতনবাবুর স্বাস্থ্যনিবাসে আনাগোনা বন্ধ হয়নি এবং এখানকার টোস্ট ও চায়ের প্রতি তার কিছুমাত্র অরুচিও দেখা যায়নি।

রতনবাবুর একটি ঘড়ির দোকান ছিল। আজ তাঁকে দেখেই মিসেস দাসের সেই কথা মনে পড়ে গেল। যাত্রী যে-ঘরে আছে সেই ঘরের একটা বড় ঘড়ি আজ দুদিন বন্ধ হয়ে গেছে, কিছুতেই চলছে না। মিসেস দাস স্থির করলেন, রতনবাবুকে অনেক চা ও টোস্ট জোগান হয়েছে, তার বিনিময়ে তাকে দিয়ে বিনামুল্যে ঘড়িটাকে আজ আবার সচল করে নিতে পারলে বোকামি করা হবে না।

অতএব মিসেস দাস সহাস্যমুখে রতনবাবুকে অভ্যর্থনা করে বললেন, আসুন, আসুন! আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম!

মিসেস দাস তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবেন ও তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন, রতনবাবুর এমন সৌভাগ্য আর কখনও হয়নি। কাজেই তিনি একেবারে আহ্লাদে-আটখানা হয়ে বললেন, বলেন কি মিসেস দাস! আমায় কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।

মিসেস দাস কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই বললেন, ওপরের ঘরের একটা ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে, আপনি সেটা সারিয়ে দিতে পারবেন?

রতনবাবু মিসেস দাসের সাদর অভ্যর্থনা ও মিষ্ট হাসির অর্থ বুঝতে পারলেন। কিন্তু মুখের ভাবে কিছু প্রকাশ না করেই বললেন, বেশ তো, এ আর এমন শক্ত কি? ঘড়িটা কোথায় আছে?

ওপরের ঘরে। আসুন আমার সঙ্গে। এই বলে মিসেস দাস চেয়ার ছেড়ে উঠে রতনবাবুকে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস দাস উপরে উঠে দেখলেন, যাত্রীর ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরের ঘড়িটা মেরামত করতে হবে। একবার ভেতরে যেতে পারি কি!

ভিতর থেকে আওয়াজ এল–আসুন।

রতনবাবুকে নিয়ে মিসেস দাস ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

ঘরের কোণের চেয়ারে দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে যাত্রী হেঁটমুখে বসেছিল। সন্ধ্যা তখন আসন্ন। মিসেস দাস আলো জ্বালবার চেষ্টা করতেই যাত্রী বলে উঠল, থাক। এখনি আলো জ্বালতে হবে না।..হ্যাঁ, ভালো কথা! আমার লগেজগুলো কাল সকালে পাব কি?

মিসেস দাস বললেন, হ্যাঁ, তা বোধহয় পাবেন। আপনার লগেজগুলো কীসের?

তার ভেতরে রাসায়নিক যন্ত্র আর অনেক রকম ওষুধের শিশি-বোতল আছে। শ্রীপুর নির্জন বলেই আমি এখানে এসেছি। নির্জনে আমি রাসায়নিক পরীক্ষা করতে চাই। কোনওরকম গোলমালই আমি সহ্য করব না।

মিসেস দাসের কৌতূহল আবার জেগে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, আপনি কি ডাক্তারি করেন?

যাত্রী সে কথার জবাব না দিয়ে আপন মনেই বললে আমি নির্জনে থাকতে ভালোবাসি। আমার চোখ এত খারাপ যে মোটেই আলো সইতে পারি না। সময়ে সময়ে আমাকে ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে রাখতে হয়। অনেক সময় আমি আবার অন্ধকারেই থাকি। এ কথাগুলি দয়া করে মনে রাখবেন।

মিসেস দাস বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দেবেন কি–

যাত্রী বাধা দিলে বললে, এখন আপনারা এ-ঘরে যা করতে এসেছেন, করুন বলেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

মিসেস দাস আর সেখানে দাঁড়ালেন না রাগে গগস করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রতনবাবু একখানা টুলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে, দেয়াল-ঘড়ির ডালা খুলে তার ভিতরটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ একবার মুখ তুলে দেখলেন, যাত্রী তার নীল-রঙা ঠুলি-চশমার ভিতর দিয়ে একদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু রতনবাবুর মনে হল যেন দু-দুটো অন্ধকারের গর্ত কটমট করে তাকে নিরীক্ষণ করছে! তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল! সে ভাবটা সামলে নেওয়ার জন্যে রতনবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, দেখছেন মশাই, আজকে আকাশের অবস্থাটা মোটেই ভালো নয়!

যাত্রীর মূর্তি একটুও নড়ল না। কিন্তু সে কর্কশ স্বরে বলে উঠল, একটা ঘড়ি ঠিক করতে কতক্ষণ লাগে? তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সরে পড়ন না!

রতনবাবু অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ! এই, আর এক মিনিটেই হয়ে যাবে! তারপর মুখ বুজে চটপট মেরামতি কাজ সেরে তিনি সে-ঘর থেকে অপরাধীর মতো সুড় সুড় করে বেরিয়ে গেলেন।

স্বাস্থ্যনিবাস থেকে বাইরে বেরিয়ে রতনবাবু নিজের বাসার দিকে অগ্রসর হলেন। খানিক পরেই মিস্টার দাসের সঙ্গে দেখা।

তাকে দেখেই মিস্টার দাস বলে উঠলেন, আরে, আরে, রতন যে! খবর কি?

রতনবাবু মুখ ভার করে বললেন, দাস, খবর বড় ভালো নয়!

কেন?

তোমার বাড়িতে একটা খুনে কি ডাকাত এসে আড্ডা জমিয়েছে!

মিস্টার দাস চমকে উঠে বললেন, কি বলচ হে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফেরার আসামি! দেখছি স্বাস্থ্যনিবাস এবার পুলিশের জিম্মায় যাবে।

মিস্টার দাস বললেন, বটে, বটে, তাই নাকি? আচ্ছা, এখনি গিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করছি। এই বলেই দ্রুতপদে বাড়িমুখো হলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরে তিনি একটি টু শব্দ করবার আগেই মিসেস দাসই তাকে সচিৎকারে আক্রমণ করলেন। বললেন, তোমার মতন মানুষের হাতে পড়ে হাড় আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেল! আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর উনি বেড়াচ্ছেন ফুর্তি করে। বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিলে বলো দিকি?

মিস্টার দাস আমতা আমতা করে বললেন, একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে আমাকে আর ভয় দেখিও না গো! আমি তো তোমার কাজেই বাইরে গিয়েছিলুম!

মিসেস দাস একটু নরম হয়ে বললেন, এখানে একজন নতুন লোক এসেছে, আর তুমি রইলে বাইরে। ফরমাজ কে খাটে বলো দিকি?

মিস্টার দাস বললেন, নতুন লোক? কে নতুন লোক? শুনলুম তাকে নাকি চোর-ডাকাত খুনের মতন দেখতে?

মিসেস দাস তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, সে তো আমাদের জামাই নয়! সে ভালো কি মন্দ দেখতে, তা নিয়ে আমাদের দরকার কি?

মিস্টার দাস বললেন, না, তা নিয়ে আমাদের দরকার নেই বটে, কিন্তু তাকে পুলিশের দরকার হতে পারে।

মিসেস দাস রাশভারী চালে বললেন, থামো, থামো! তোমাকে আর বেশি বাজে বকতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও!

মিস্টার দাসের আর কিছু বলবার সাহস হল না। তিনি মনে মনে এই ভাবতে ভাবতে অন্যদিকে চলে গেলেন, মেয়েরা চিরকালই এমন বোকা হয়! বিপদে না পড়লে তারা বিপদকে বিপদ বলে বুঝতেই পারে না!

.

তৃতীয় । পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা জীব

পরের দিন সকালবেলায় যাত্রীর লগেজগুলো এসে হাজির হল।

গাড়ি থেকে লগেজগুলো যখন নীচে নামানো হচ্ছিল, যাত্রীও তখন সেখানে এসে ব্যস্ত হয়ে তদ্বির করতে লাগল। লগেজের মধ্যে ছিল গোটা-দুয়েক বড় বড় পোর্টম্যান্টো, দু-বাক্স ভর্তি মোটা মোটা বই, আর অনেকগুলো শিশি-বোতল–তাদের ভিতরে টলটল করছে নানান রঙের ওষুধের মতন তরল জিনিস।

মিস্টার দাসের একটা কুকুর ছিল, তার নাম হচ্ছে ডগি। যাত্রী তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু সে যাত্রীকে দেখতে পেলে। দেখে সে আর বেশি কিছু করলে না, দৌড়ে এসে কেবল যাত্রীর পায়ের উপরে দিলে দাঁত খিঁচিয়ে এক কামড়! মিস্টার দাস তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ডগিকে এক লাথি মেরে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিলেন। ডগি কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে সরে পড়ল। যাত্রীর কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গিয়েছিল, সেও তাড়াতাড়ি বাড়ির উপরে উঠে গেল।

মিসেস দাস বললেন, যেমন মনিব তার তেমনি কুকুর! তোমার কুকুর যদি অতিথিদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করে তাহলে শিগগিরিই আমাদের স্বাস্থ্যনিবাস তুলে দিতে হবে!

মিস্টার দাস বললেন, সত্যি, ডগির অপরাধ আমি স্বীকার করছি! ভদ্রলোকের কি হল আমি এখুনি গিয়ে দেখে আসছি।

তিনি সিধে উপরে গিয়ে উঠলেন। যাত্রীর ঘরের দরজা খোলাই ছিল, চৌকাঠ পার হয়ে তিনি ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের জানলাগুলো আগেকার মতোই বন্ধ ছিল। ভিতরের আধা-অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু মিস্টার দাস যেন কি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলেন। যেন ছায়া ছায়া কি একটা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, যেন একখানা বাহুহীন হস্ত শূন্যে ভাসতে ভাসতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর কী যে হল স্পষ্ট বোঝা গেল না, কিন্তু কে যেন এক ধাক্কা মেরে তাঁকে ঘরের বাইরে তাড়িয়ে দিলে! সঙ্গে সঙ্গে দুম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ও খিল দেওয়ার শব্দ হল! ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে মিস্টার দাস কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না। ছায়াময় ঘর, অস্পষ্ট একটা আকারের আভাস ও বিষমা এক ধাক্কা! অত্যন্ত অবাক হয়ে মিস্টার দাস ভাবতে লাগলেন, তিনি স্বচক্ষে যা দেখলেন সেটা হচ্ছে কী?

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, মিস্টার দাস চিন্তিত মুখে নীচে নেমে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে তখন স্বাস্থ্যনিবাসের ভাড়াটে বাসিন্দাদের জটলা শুরু হয়ে গেছে। এবং মিসেস দাস সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন–পৃথিবীতে যতরকমের জীব আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচা জীব হচ্ছে, কুকুর। আর পৃথিবীতে যতরকমের কুকুর আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচা কুকুর হচ্ছে, ডগি। স্বাস্থ্যনিবাসের অতিথিদের ওপরে ডগির কোনওই দরদ নেই। ভদ্রলোককে সে আজ কামড়ে দিয়েছে! না জানি এখন তার কতই কষ্ট হচ্ছে!

মিস্টার দাস বললেন, তোমার অতিথির জন্যে তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না! বোধ। হয় তাঁর বিশেষ কিছুই হয়নি। তার চেয়ে লগেজগুলো ঘরের ভেতরে আনাবার ব্যবস্থা করো।

পিছন থেকে গলার আওয়াজ এল, না, না–আমার কিছুই হয়নি! লগেজগুলো তাড়াতাড়ি আমার ঘরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন।

সকলে ফিরে দেখলে জামা কাপড় বদলে যাত্রী আবার নীচে নেমে এসেছে। লগেজগুলো যেই ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল অমনি যাত্রীর আর তর সইল না। তখনি ব্যস্তভাবে সে পোর্টম্যান্টো ও বাক্সগুলো খুলে ফেললে। তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল মোটা বোতল, বেঁটে বোতল, ঢ্যাঙা বোতল; কোনওটার রং নীল, কোনওটার লাল, কোনওটার বা সবুজ; অনেকগুলোর গায়ে বড় বড় হরফে বিষ বলে লেখা রয়েছে। পাতলা পুরু লম্বা ছোট কত রকমের বই! টেবিলের উপরে ওইসব শিশি-বোতল সাজিয়ে নিয়ে, সামনের চেয়ারে বসে যাত্রী এক মনে কি কাজ করতে লাগল।

দুপুরবেলায় মিসেস দাস যখন উপরে এলেন, তখন ঘরের চেহারা দেখেই তার চক্ষু স্থির! প্যাকিংয়ের চটে, খড়ের টুকরোয় ও দড়িদড়ায় তার ঘরের মেঝে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনি তখনি সেই জঞ্জালগুলোকে নিজের হাতে ঘরের ভিতর থেকে বিদায় করে দিতে লাগলেন। যাত্রী তখন এমন এক মনে কাজ করছিল যে মিসেস দাসের অস্তিত্ব টেরই পেলে না!

মিসেস দাস ঘর পরিষ্কার করে বললেন, আপনি চারদিক এমন নোংরা করে রাখবেন না। তাহলে স্বাস্থ্যনিবাসের বদনাম হবে।

যাত্রী চমকে ফিরে তাকালে। তখন সে চোখ থেকে চশমা খুলে রেখেছিল। মিসেস দাসের মনে হল তার চোখের কোটরে যেন চোখদুটো নেই, খালি দুটো গর্ত! মিসেস দাস ভাবলেন তারই দেখবার ভুল। যাত্রী তখনি চশমাখানা আবার পরে নিলে।

তারপর বললে, আপনি সাড়া না দিয়ে ঘরের ভেতরে এলেন কেন?

মিসেস দাস বললেন, আমি সাড়া দিয়েছিলুম, আপনি শুনতে পাননি–

যাত্রী বাধা দিয়ে বললে, হতে পারে কিন্তু সামান্য একটু শব্দেই আমার কাজের বড় ক্ষতি হয়।

মিসেস দাস বললেন, তাহলে আপনি তো এক কাজ করতে পারেন! এবার থেকে আপনি যখন কাজ করবেন, ঘরের দরজায় ভেতর থেকে খিল দিয়ে রাখবেন।

এ খুব সঙ্গত কথা।

কিন্তু মশাই, এই খড়গুলো–

যাত্রী আবার বাধা দিয়ে বললে, ঘরের ভেতরে খড়কুটো পড়লে তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। যদি কিছু লোকসান হয় আপনি আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবেন।

মিসেস দাস কেবল বুদ্ধিমান স্ত্রীলোক নন, তাঁকে নাছোড়বান্দাও বলা যেতে পারে। তিনি বললেন, কিন্তু আজ এই যে আপনি আমার ঘর-দোর নোংরা করেছেন–

যাত্রী বললে, তার জন্যে আমার পাঁচ টাকা জরিমানা হল। ব্যস, এখন আর কোনও কথা নয়।

মিসেস দাস খুব খুশিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাত্রীর কর্কশ কথা ও ব্যবহারের জন্যে এখন আর তার মনের উপরে কোনও দাগই পড়ল না, কারণ এমন পাঁচ টাকা জরিমানা পেলে মনের সব ময়লাই ধুয়ে যায়!

এরই খানিকক্ষণ পরে মিসেস দাস যখন আবার যাত্রীর ঘরের সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বন্ধ দ্বারের ওপার থেকে হঠাৎ একটা ঝনঝনানির আওয়াজ তাঁর কানে গিয়ে ঢুকল। কে যেন শিশি বোতল সাজানো টেবিলের উপরে সজোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিলে! তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তারপরেই যাত্রীর গলার আওয়াজে শুনলেন–আমি আর পারছি না, আমি আর পারছি না!–এর জন্যে আমার সারা জীবনই কেটে যাবে! অস্থির হব না?

অস্থির না হয়ে আর উপায় কি? হারে নির্বোধ!

.

চতুর্থ । হাত নেই-হাতা

শ্রীপুরের স্বাস্থ্যনিবাসে যাত্রীর দিন একভাবেই কাটতে লাগল।

শ্রীপুরের ঘরে-ঘরে কিন্তু গুজবের অন্ত নেই। যাত্রীর সেই আপাদমস্তক ঢাকা ব্যান্ডেজ করা কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি দেখলেই শ্রীপুরের পথ থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভূত! ভূত! বলে চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যায়! পথের উপরে রাত্রিকালে যাত্রীর মূর্তি দেখলে ছেলেমেয়েদের বাপেদের গা ছমছম করে ওঠে! যাত্রী কারুর সঙ্গে মেশে না, তার পরিচয়ও কেউ জানে না, এত ঠাঁই থাকতে কেন যে সে শ্রীপুরে এসে আবির্ভূত হয়েছে, সে রহস্যও কেউ বুঝতে পারে না! শ্রীপুরের পাড়ায় পাড়ায় যাত্রীর কথা নিয়ে উত্তেজনার অন্ত নেই!

রতনবাবুর আগেকার মত তো আমরা আগেই জানতে পেরেছি। আগে তিনি যাত্রীকে খুনি ও ডাকাত বলেই প্রচার করতেন। এখন তাঁর মতে, যাত্রী হচ্ছে সর্বনেশে স্বদেশি বোমাওয়ালা!

যাত্রী সারাদিন বন্ধ দরজার আড়ালে বসে তার শিশি বোতল আর বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই নিজের সঙ্গে কথাবার্তা কয় এবং যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসে, তখন আগাপাশতলা জামাকাপড়ে মুড়ে শ্রীপুরের নির্জন পথে একটি বেড়াতে বেরোয়!

কেউ কেউ মিসেস দাসকে জিজ্ঞাসা করে, যাত্রীর নাম কী?

মিসেস দাস জবাব দেন, তিনি নাম আমাকে বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। নিজের মুখ ও যাত্রীর সুনাম রক্ষা করবার জন্যেই মিসেস দাস ওরকম বাজে কথা বলতে বাধ্য হন। যাত্রীর ব্যবহার খুব ভদ্র ও গলার আওয়াজ খুব মিষ্ট না

হলেও স্বাস্থ্যনিবাসের বিলের টাকা কোনওদিনই সে বাকি রাখেনি এবং মিসেস দাসকে মাঝেমাঝে জরিমানার টাকা দিতেও কোনওদিন সে আপত্তি করেনি। মিসেস দাসের মতে এমন প্রথম শ্রেণির অতিথি জীবনে একবার মাত্রই পাওয়া যায়।

মিস্টার দাস একথা মানতেন না। যাত্রীকে তার মনে ধরেনি। রতনবাবুর মতন তিনিও যাত্রীকে মনে মনে সন্দেহ করতেন।

কিন্তু মিসেস দাসের সামনে এ সন্দেহ প্রকাশ করলেই ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠত। তিনি ঘন ঘন হাত-মুখ নেড়ে বলতেন, আহা, কোনও দৈব-দুর্ঘটনায় বেচারির মুখে চোট লেগেছে তাই সে ব্যান্ডেজ বেঁধে থাকে! স্বাস্থ্যনিবাসে সে সারতে এসেছে। চোর-ডাকাত হলে সে কখনও বিলের টাকা এমন করে শোধ করত?

শান্তিভঙ্গের ভয়ে মিস্টার দাস আর কিছুই বলতেন না।

শ্রীপুরে এক সরকারি ডাক্তার ছিলেন, তাঁর নাম মানিকবাবু। নানান লোকের মুখে নানান কথা শুনে একটা বাজে ওজর নিয়ে মানিকবাবু একদিন যাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

মানিকবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, ইজিচেয়ারের উপরে একখানা বই নিয়ে ব্যান্ডেজ করা মুখে এক ব্যক্তি শুয়ে আছে।

তাঁকে দেখেই লোকটা উঠে বসে গম্ভীর স্বরে বললে, এখানে আপনার কি দরকার?

মানিকবাবু বললেন, মশাই, আমি সরকারি হাসপাতালের জন্যে চাঁদা আদায় করতে এসেছি।

যাত্রী ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেলে বললে, বটে!

মানিকবাবু শুধোলেন, কিছু দেবেন কি?

যাত্রী আবার হেঁচে বললে, সে কথা পরে ভাবা যাবে। তারপর আবার হাঁচলে।

মানিকবাবু বললেন, অত হাঁচছেন কেন? সর্দি হয়েছে নাকি?

যাত্রী বললে, হ্যাঁ।

মানিকবাবু বললেন, আমি ডাক্তার। সর্দির একটা ওষুধ লিখে দেব?

যাত্রী আবার নিজের কেতাবের দিকে তাকিয়ে বললে, সেটা আপনার ইচ্ছে!

মানিকবাবু নিজের পকেট থেকে একটু টুকরো কাগজ আর পেনসিল বার করে কি একটা ওষুধের নাম লিখলেন। তারপর সেই কাগজের টুকরোটা যাত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নিন।

আলোয়ানের ভিতর থেকে জামার একটা হাত বেরুল! কেবল জামার হাতা–মানুষের হাতের কোনওই চিহ্ন নেই! অথচ সেই হস্তহীন জামার হাতা ঠিক স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে এসে মানিকবাবুর হাত থেকে কাগজের টুকরোটা গ্রহণ করলে! ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে তার দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন হয়ে উঠল। এবং মানিকবাবুর মুখ-চোখের ভাব দেখেই যাত্রী জামার হাতটা সাঁৎ করে আবার আলোয়ানের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললে।

সেই কনকনে শীতেও মানিকবাবুর কপালে ঘামের ফোঁটা ফুটে উঠল। অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, আপনার কি হাত কাটা গেছে? কিন্তু কাটা হাতে আপনি আমার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিলেন কেমন করে?

তাই নাকি? বলেই যাত্রী সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল।

মানিকবাবু দু-পা পিছিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ। আপনার হাত নেই, খালি জামার হাতা আছে!

যাত্রী দু-পা এগিয়ে এসে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, আমার হাত নেই খালি জামার হাতা আছে! বটে? আলোয়ানের ভিতর থেকে আবার হস্তহীন জামার হাতা বেরুল হাতাটা একেবারে

মানিকবাবুর মুখের সামনে এসে হাজির হল–তারপর কে যেন দুটো অদৃশ্য আঙুল দিয়ে তার নাকটা খুব জোরে মলে দিলে!

এর পরেও কোনও ভদ্রলোকেরই সে-ঘরে থাকা উচিত নয়। মানিকবাবু তিন লাফে দরজা পেরিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়লেন। তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলেন, ঘরের ভিতর থেকে যাত্রী অট্টহাস্য করে উঠল।

স্বাস্থ্যনিবাসের বৈঠকখানার বসে মিস্টার দাস তখন মিসেস দাসের সঙ্গে তর্ক করছিলেন। হঠাৎ মড়ার মতন সাদা মুখ নিয়ে মানিকবাবুকে সেখানে আসতে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কি হয়েছে মানিকবাবু, অত ছুটে আসছেন কেন? ডগি তাড়া করেছে বুঝি?

মানিকবাবু ছুটে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে ধপাস করে বসে পড়ে বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, মিস্টার দাস! ওঃ, হাত নেই খালি জামার হাতা!

মিস্টার দাস সবিস্ময়ে বললেন, কি বলছেন ডাক্তারবাবু? হাত নেই জামার হাতা?

মানিকবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ! হাত নেই–জামার হাতা! ওপরের ঘরের সেই ভূতুড়ে লোকটার হাত নেই খালি জামার হাতা আছে। জামার হাতা দিয়ে সে আমার নাক মলে দিলে! বলেই তিনি দুই চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

.

পঞ্চম । ডাক্তারের বাড়িতে চুরি

সরকারি হাসপাতালের এক অংশে সরকারি ডাক্তার মানিকবাবু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতেন।

হস্তহীন জামার হাতা দেখে মানিকবাবুর, শরীরটা আজ বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছিল। মিস্টার ও মিসেস দাস ও নিজের স্ত্রী বিমলার কাছে বারবার তিনি এই গল্প বলেছেন কিন্তু তাঁর কথায় ওঁরা কেউই বিশ্বাস করতে রাজি হননি। তাঁদের সকলেরই মত হচ্ছে, জামার হাতাটা হয়তো বেশি লম্বা ছিল বলেই হাতখানা তিনি দেখতে পাননি। শেষটা মানিকবাবু নিজেও মনে করলেন, হয়তো সেই কথাই ঠিক হবে, তারই চোখের ভুল!

অনেক রাতে মানিকবাবুর ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই তিনি শুনলেন তাঁর স্ত্রীর বিমলা তাঁকে ধাক্কা মারতে মারতে বলছেন, ওগো ওঠো! শিগগির ওঠো!

মানিকবাবু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, কিগো, কি হয়েছে?

চোর, চোর! বাড়িতে চোর এসেছে!

চোর নামে কি জাদু আছে! এক পলকে মানিকবাবুর সব জড়তা কেটে গেল, এক লাফে ঘরের কোণে গিয়ে একগাছা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে, মাথার উপরে বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি বললেন, কোথায় সেই বদমাইশ? দেখিয়ে দাও আমাকে!

স্বামীর বীরত্ব দেখে বিমলা আশ্বস্ত হলেন না, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আপাতত তোমার লাঠি ঘোরানো থামাও। চোর এ-ঘরে নেই।

মানিকবাবু স্ত্রীর কথামতো কাজ করে বললেন, তবে সে হতভাগা কোথায়?

বিমলা বললেন, পাশের ঘরে। চুপিচুপি আমার সঙ্গে এসো, নইলে তাকে ধরতে পারবে না।

দুজনে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েই শুনলেন, অন্ধকারে ফ্যাচ করে কে হেঁচে ফেললে। তারপরেই সুইচ টিপে কে আলো জ্বাললে। তারপরেই শোনা গেল কে যেন দেরাজের দরজাটা টেনে খুলে ফেললে।

মানিকবাবু একেই তো চোর-টোর পছন্দ করতেন না, তার উপরে যখন তার মনে পড়ল, দেরাজের ভিতরে আজ সকালেই তিনি পঁয়ত্রিশখানা দশ টাকার নোট রেখে দিয়েছেন, তখন আর কিছুতেই তিনি শান্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। কে রে, কে রে বলে বিকট স্বরে চাঁচাতে চাঁচাতে এবং লাঠি ঘোরাতে-ঘোরাতে মহাবেগে তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন!

বিমলাও ঘরে ঢুকে বললেন, ওগো থামো–থামো!

কিন্তু মানিকবাবু থামলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহেই লাঠি ঘোরাতে লাগলেন।

বিমলা আবার বললেন, ওগো মহাবীর, আর লাঠি ঘুরিয়ে কাজ নেই! চোর পালিয়েছে!

লাঠি ঘোরানো থামিয়ে মানিকবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, পালিয়েছে। কোন দিক দিয়ে পালাল?

বিমলা বললেন, জানি না।

মানিকবাবু অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, সত্যই ঘরের মধ্যে কেউ নেই! এ ঘরের দরজা তো মোটে একটি, আর তার সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন তারা দুজনে। তবে চোর পালাল কোনদিক দিয়ে?

মানিকবাবু বললেন, কিন্তু তখন ঘরের ভেতরে হাঁচলে কে?

বিমলা বললেন, আর ঘরের ভেতরে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে কে?

মানিকবাবু বললেন, আর দেরাজটাই বা খুললে কে?

বিমলা দেরাজের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন, আর তোমার দেরাজের ভেতর। থেকে সাড়ে তিনশো টাকাই বা গেল কোথায়?

এসব কথার উত্তর কেউ দিল না বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরেই কে আবার ফাঁচ করে হেঁচে ফেললে।

মানিকবাবু ও বিমলা ভয়ানক চমকে উঠলেন।

তারপরেই তারা হতভম্ব হয়ে দেখলেন, ঘরের দরজাটা আপনা-আপনি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল–ও সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বাহির থেকে দরজায় কে শিকল তুলে দিলে।

বিমলা দৌড়ে গিয়ে দরজাটা টেনে বললেন, দরজা কে বন্ধ করে দিয়ে গেছে!

মানিকবাবুর হাত থেকে প্রথমে লাঠি খসে পড়ল, তারপর তিনি নিজেও কাঁপতে কাঁপতে মাটির উপরে বসে পড়লেন এবং তারপর কপালে দুই চোখ তুলে তিনি বললেন, গিন্নি! হাত নেই–খালি জামার হাতা! মানুষ নেই–তবু হাঁচি! চোর নেই–তবু টাকা লোপাট! গিন্নি, আমাকে তুমি ধরো আমার ঘাড়ে আজ ভূতে ভর করেছে! বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

বিমলা স্বামীর কাছে গিয়ে বসে পড়তে পড়তে শুনতে পেলেন ঘরের বাইরে কে খিলখিল করে হেসে উঠল।

.

ষষ্ঠ । টেবিল-চেয়ারের নাচ

যে-সময়ে মানিকবাবু চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, ঠিক সেই সময়ে স্বাস্থ্যনিবাসের আর এক দৃশ্যের অবতারণা হল।

মিসেস দাসের শরীর অনেক রাত্রে হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়াতে, মিস্টার দাস একটা ওষুধের খোঁজে বৈঠকখানায় দিকে গেলেন।

যাত্রীর ঘরের সুমুখ দিয়ে যাওয়ার সময় মিস্টার দাস অবাক হয়ে দেখলেন, সে-ঘরের দরজা খোলা রয়েছে।

তাঁর কেমন সন্দেহ হল। দরজায় পাশেই আলোর সুইচটা ছিল, আলো জ্বেলে দেখলেন ঘরের ভিতরে যাত্রী নেই! ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত তখন তিনটে। এত রাত্রে যাত্রী কোথায় গেল? ভাবতে ভাবতে তিনি নেমে গিয়ে বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকলেন। তারপর ওষুধের শিশিটা নিয়ে ফিরে আসবার সময় তার চোখ পড়ল সদর দরজায় উপরে। সদর দরজায় ভিতর দিকের খিল খোলা! মিস্টার দাসের বেশ মনে পড়ল, তিনি নিজের হাতে খিল লাগিয়ে দিয়ে গেছেন।

কিছুই আর বুঝতে বাকি রইল না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মিসেস দাসকে ডেকে তিনি বললেন, ওগো, শুনচ? ব্যাপার গুরুতর!

মিসেস দাস তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললেন, তার মানে?

রতনবাবুর কথাই ঠিক। আমাদের এই নতুন ভাড়াটেটা হয় খুনি, নয় ডাকাত, নয় স্বদেশি বোমাওয়ালা।

মিসেস দাস এবারে দাঁড়িয়ে উঠে আবার বললেন, তার মানে?

সে লোকটা ঘরে নেই। সদর দরজা খোলা। এই নিশুত রাতে বাড়ির বাইরে সে কি করতে গেছে?

মিসেস দাস হাত-মুখ নেড়ে বললেন, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

তাহলে নিজের চোখে দেখবে এসো।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুনলেন, সদর-দরজা খোলার ও বন্ধ করার শব্দ! দুজনেই বিস্মিত হয়ে দুজনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন–কেউ কিছু বললেন না।

দুজনে যখন সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ ফাঁচ করে হাঁচির শব্দ হল!

মিস্টার দাস ভাবলেন, তার স্ত্রী বোধহয় হেঁচে ফেললেন। মিসেস দাসের ধারণা হল ঠিক উলটো–এ হাঁচি নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীর!

মিসেস দাস যখন যাত্রীর ঘরের কাছে এসেছেন, তখন ঠিক তার কাঁধের উপরে আবার কে হেঁচে দিলে। এবারে চমকে মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখলেন, মিস্টার দাস তাঁর কাছ থেকে প্রায় দশ-বারো হাত তফাতে আছেন! অথচ হাঁচির শব্দ হল ঠিক তার কানের কাছেই! মিসেস দাস অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

দুজনে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। যাত্রীর জুতো, জামা, কাপড়, আলোয়ান ও সেই বিশি ব্যান্ডেজগুলো ঘরের মেঝেয়, টেবিলের ও বিছানার উপরে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে!

আচম্বিতে তাঁরা স্তম্ভিত চক্ষে দেখলেন, জুতোজোড়া প্রথমে সজীব হয়ে নড়ে উঠল, তারপর গটগট করে বিছানার কাছে গিয়ে থেমে পড়ল!

মিসেস দাস হতভম্বের মতন দুই চোখ দু-হাতে রগড়ে আবার ভালো করে চাইতেই দেখলেন, যাত্রীর ঠুলি চশমাখানা শুন্যে স্থির হয়ে তার দিকেই যেন কটমট করে চেয়ে আছে!

তারপরেই ঘরের টেবিলটা হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে হড়াৎ করে এগিয়ে এসে মিস্টার দাসকে মারলে এক বিষমধাক্কা!

তারপরেই চেয়ারখানা হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠল এবং বেগে মিসেস দাসের দিকে তেড়ে এল! কিন্তু মিসেস দাস চেয়ারের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন না, তিরের মতন ছুটে ঘরের

ভিতর থেকে পালিয়ে গেলেন। তার স্ত্রী যে এমন বেগে ছুটতে পারেন, মিস্টার দাস এতদিনেও তা জানতে পারেননি। বলা বাহুল্য তিনিও আর সে-ঘরে রইলেন না।

মিসেস দাস নিজের ঘরের সুমুখে গিয়ে মাটির উপরে ধড়াস করে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং সে অবস্থায় যেমন করে চাচানো উচিত, ঠিক তেমনি করেই চাচাতে কিছুমাত্র কসুর করলেন না।

সে-রাত্রে সমস্ত স্বাস্থ্যনিবাসের ঘুম ভেঙে গেল। সকলেই ঘটনাস্থলে ছুটে এল। জিজ্ঞাসা করতে লাগল–কি হয়েছে? আগুন লেগেছে? ডাকাত পড়েছে নাকি? প্রভৃতি।

মিসেস দাস হাপুস চোখে কাঁদতে কাঁদতে হাত নেড়ে নেড়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বললেন, হায়, হায়, হায়,! ও চেয়ার যে আমার বাবার দেওয়া গো! অমন পুরোনো আর বিশ্বাসী। চেয়ার কিনা আজ আমাকেই তেড়ে এল? ওগো, আমাদের ওই ব্যান্ডেজ বাঁধা নতুন ভাড়াটেটা ভুতের সর্দার! তার মন্ত্রে আমার পুরোনো টেবিল-চেয়ারের ঘাড়ে ভূত চেপেছে! সারা ঘর জুড়ে টেবিল আর চেয়ার নাচ আরম্ভ করেছে। আমি কেতাবে পড়েছি, ভূতে পেলেই টেবিল চেয়ার জ্যান্ত হয়ে নাচতে থাকে।

মিস্টার দাস বললেন, হ্যাঁ, কেতাবে আমিও টেবিল-চেয়ার জ্যান্ত হওয়ার কথা পড়েছি বটে! কিন্তু খালি জুতো যে জ্যান্ত হয়ে নিজেই হাঁটাহাঁটি শুরু করে, কেতাবে এমন কথা তো কখনও পড়িনি!

মিসেস দাস বললেন, আর সেই চশমাখানা? সেখানাও তো ঘরময় পাখির মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল! মা-গো মা, এমন অনাসৃষ্টি কেউ কখনও দেখেছে না শুনেছে?

সকলে মিলে দাঁড়িয়ে গোলমাল করছে, এমন সময় যাত্রী উপর থেকে নেমে সেইখানে এসে দাঁড়াল। কর্কশ স্বরে বললে, এত গোলযোগ কীসের শুনি? রাতটা সৃষ্টি হয়েছে ঘুমোবার জন্যে, চিৎকার করবার জন্যে নয়। এসব আমি সহ্য করব না। এই বলে সে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলে সভয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল–এমনকী মিসেস দাস পর্যন্ত আর উচ্চৈস্বরে নিজের মতামত প্রকাশ করতে সাহস করলেন না।

.

সপ্তম । যাত্রীর ছদ্মবেশ ত্যাগ

পরদিন শ্রীপুর শহরে ছিল চড়কের উৎসব। রাজপথে আশেপাশে খোলা জমির উপরে মেলা বসেছে নানা জায়গা থেকে নানা দোকানি-পসারি নানানরকম রংচঙে লোভনীয় জিনিস এনে সাজিয়ে রেখেছে। নাগরদোলায় চড়ে কোথাও ছেলেমেয়ের দল হাসিখুশির গোলমাল করছে, কোথাও বায়োস্কোপের তাঁবু খাটানো হয়েছে এবং কোথাও বা ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য।

এদিকে স্বাস্থ্যনিবাসের বৈঠকখানায় তখনও সবাই মিলে ঘোঁট পাকিয়ে তুলছে। মিস্টার দাস এসব আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট না করে থানায় খবর দিতে বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরে উপর তলা থেকে কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ এলমিসেস দাস, মিসেস দাস!

সে-ডাক বৈঠকখানায় মিসেস দাসের কানে গেল বটে, কিন্তু তার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হল না যে, তিনি কিছু শুনতে পেয়েছেন!

খানিক পরে যাত্রী আবার ক্রুদ্ধ স্বরে হাঁকলে–মিসেস দাস! শীগগির আমার খাবার পাঠিয়ে দিন!

মিসেস দাস তবু কোনওরকম ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন না,–এক মনে তার ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে চেয়ার-টেবিলের অদ্ভুত নৃত্য কাহিনি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

খানিক পরে যাত্রী নিজেই নীচে নেমে এল। মিসেস দাসের সামনে এসে একটা গোল টেবিলের উপরে সজোরে করাঘাত করে বললে, মিসেস দাস! আপনি কি মনে করেন, আমি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে স্বাস্থ্যনিবাসে এসেছি?

এইবার মিসেস দাসের মুখ ফুটল। তিনিও টেবিলের উপরে সমান জোরে চড় মেরে বলে উঠলেন, আপনি কি মনে করেন, ভূত নামাবার জন্য আপনাকে আমি ঘর ছেড়ে দিয়েছি?

যাত্রী বললে, আপনার কথার অর্থ কি?

মিসেস দাস বললেন, আপনার জন্যে আমার বিশ্বাসী টেবিল-চেয়ার পর্যন্ত আমাকে আর গিন্নি বলে মানে না! নাচবার জন্যে টেবিল-চেয়ার তৈরি করা হয়নি! কে ওদের এমন নাচতে শেখালে? কে আপনি? আপনার নাম কী? আমার ঘরে বসে আপনি কী করেন? কাল অত রাত্রে বাইরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আর ফিরে এলেনই বা কেমন করে?

বিষম রাগে যাত্রীর দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল! হঠাৎ ভীষণ চিৎকার করে সে বলে উঠল, চুপ করো! কে আমি? তোমরা জানতে চাও? তোমরা দেখতে চাও? দেখো তবে!বলেই সে তার মুখের ব্যান্ডেজে মারলে এক টান! ব্যান্ডেজ, ঠুলি-চশমা, নকল গোঁফ দাড়ি আর তার নকল নাকটা সকলের চোখের সামনে খসে পড়ল! সবাই দারুণ আতঙ্কে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে–একটা জামা-কাপড়-পরা মূর্তি পায়ে পায়ে ক্রমেই এগিয়ে আসছে কিন্তু সে মূর্তির স্কন্ধের উপরে মুখমণ্ডলের কোনও চিহ্নই নেই।

বৈঠকখানায় মহা হুড়োহুড়ি লেগে গেল–চিৎকার, কান্না, আর্তনাদ! মিসেস দাস আঁ বলে চেঁচিয়ে উঠে প্রচণ্ড গতর নিয়ে পালাতে গিয়ে দড়াম করে এক আছাড় খেলেন কিন্তু সেই অবস্থাতেই আশ্চর্য কৌশলে ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে চোখের নিমেষে তিনি কোথায়। অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাকি লোকেরাও কে যে কেমন করে কোন দিকে সরে পড়ল, কিছুই বোঝা গেল না। আধ মিনিটেই ঘর একেবারে খালি।

স্কন্ধকাটা মূর্তিটা মিনিটখানেক সেখানে পায়চারি করে আবার বাড়ির ভিতরে চলে গেল। ধীরে ধীরে।

এ-খবর শ্রীপুরের পাড়ায় পাড়ায় রটে যেতে বেশি দেরি লাগল না! চড়কের মেলার কথা সবাই ভুলে গেল–আধঘণ্টার ভিতরে শহরের সমস্ত জনতা স্বাস্থ্যনিবাসের সামনে এসে হাজির। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে কেবল একই কথা–জুজু! জুজু! জুজু! স্বাস্থ্যনিবাসে জুজুবুড়ো এসেছে!

এমন সময়ে দুজন চৌকিদার ও দারোগাকে সঙ্গে করে মিস্টার দাস, রতনবাবু আর মানিকবাবু বিজয়ী বীরের মতন সদর্পে স্বাস্থ্যনিবাসে এসে ঢুকলেন।

দারোগা শুধোলেন, কোথায় সে লোক?

এই যে, এই দিকে আসুন।বলে মিস্টার দাস সবাইকে নিয়ে যাত্রীর ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

সেই স্কন্ধকাটা মূর্তি ঘরের মাঝখানে একখানা চেয়ারের উপরে স্থির হয়ে বসেছিল।

বলা বাহুল্য, প্রথমে সকলেই ভড়কে গেল মিস্টার দাস, রতনবাবু ও মানিকবাবু তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে, দরকার হলেই পালাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

দারোগা বললেন, ওসব ম্যাজিক আমি ঢের দেখেছি। আমার হাতে যখন ওয়ারেন্ট আছে, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব সবাইকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি! –এই বলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

স্কন্ধকাটা যাত্রী বললে, কে তোমরা? কী চাও?

দারোগা বললেন, তোমাকে গ্রেপ্তার করব!

যাত্রী উঠে দাঁড়াল। দারোগা এক লাফে যাত্রীর কাছে গিয়ে তার দস্তানাপরা একখানা হাত চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দস্তানাটা দারোগার হাতে খুলে এল এবং যাত্রীর হাতখানা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তখন আর কারুর এসব দেখে আশ্চর্য হওয়ার অবকাশ ছিল নাদারোগা ও চৌকিদারেরা সেই হস্তহীন স্কন্ধকাটা মূর্তিটাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে।

মুখহীন মুখ থেকে আওয়াজ–ওঃ বড় লাগছে! তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আত্মসমর্পণ করছি।

দারোগা ও চৌকিদারেরা যাত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তাকে আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা বললে, নাও, এখন হাতকড়ি পরো।

যাত্রী বললে, কেন, আমি কি দোষ করেছি? আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য হওয়া কি অপরাধ?

দারোগা টিটকিরি দিয়ে বললে, কি বললে? অদৃশ্য মানুষ? ম্যাজিকে আমি অমন ঢের ঢের অদৃশ্য মানুষ দেখেছি! আমার সঙ্গে ওসব চালাকি চলবে না!

যাত্রী বললে, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? এই দেখুন!বলেই সে নিজের গায়ের আলোয়ান চটপট খুলে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের উপর দিকটা অদৃশ্য হয়ে গেল! তারপরেই সে পরনের কাপড়খানা খুলতে লাগল!

দারোগা এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অবাক হয়ে এই সব দেখছিলেন। এখন যাত্রীকে কাপড় খোলবার চেষ্টা করতে দেখেই তিনি তার আসল মতলব খানা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, এই চৌকিদার! ওকে ভালো করে চেপে ধরে থাক-নইলে কাপড় খুললেই ও একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে!

কিন্তু তার আগেই যাত্রী কাপড়খানা খুলে ফেলে এক লাফে তাদের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ল! তখন দেখা গেল, কেবল জুতো মোজা পরা দুখানা হাঁটু পর্যন্ত পা ঘরময় লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য মানুষ তার জুতো মোজাও খুলে ফেললে এবং জুতোর একপাটি মিস্টার দাসের দিকে ও আর একপাটি দারোগার দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে।

তারপর সে-এক অপূর্ব দৃশ্য! ঘরের ভিতরে মহা শোরগোল পড়ে গেল! –ওই– ওইদিকে সে গিয়েছে!–বাপরে বাপ, আমায় লাথি মারলে!–ব্যাটা আমাকে ঘুষি মেরেছে! এইবারে তাকে ধরেছি! ওই যাঃ! আবার পালিয়ে গেল! ওরে বাপরে, গেছি রে!

অদৃশ্য মানুষ কখন যে কোন দিকে যাচ্ছে, কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না, মাঝখান থেকে কিল-চড়-ঘুষি-লাথি খেয়ে প্রত্যেকেরই প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠল! বেদম প্রহার খেয়ে দারোগাবাবু তো মেঝের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন, রতনবাবুর গোঁফের একপাশ একদম উড়ে গেল এবং মিস্টার দাসের উপর-পাটির তিন-তিনটে দাঁতের আর কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না!

তারপরেই প্রথমে ঘরের দরজার কাছে এবং তারপরেই সিঁড়ির উপরে দুমদুম শব্দ শুনে সকলেই বুঝতে পারলে অদৃশ্য মানুষ সে ঘরথেকে সকলের অগোচরে চলে গেল।

তখন স্বাস্থ্যনিবাসের সামনে যে জনতা এসে জমা হয়েছিল, তার ভিতরে এক বিষম বিভীষিকার সাড়া উঠল!–অদৃশ্য মানুষ রাস্তায় এসেছে! অদৃশ্য মানুষ রাস্তায় এসেছে প্রত্যেকেই এই কথা বলতে বলতে মহাভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

শহরের বাইরেই ছোট একটি নদী পাহাড়ের কোল দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর ধারে আতাগাছের ছায়ায় একখানা পাথর-আসনে বসে শ্রীপুরের মহাকবি অবলাকান্ত একমনে কবিতা রচনা করছিলেন।

অবলাকান্ত হঠাৎ চমকে উঠলেন-ঠিক তার পাশেই ফাঁচ করে কে হেঁচে ফেললে! অবলাকান্ত একবার সামনে, একবার পিছনে, একবার ডাইনে ও একবার বামে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলেন কিন্তু হাঁচির মালিকের একগাছা টিকিও দেখা গেল না।

অবলাকান্ত ক্যাবলাকান্তের মতন তাকিয়ে আছেন, এমন সময়ে ঠিক তার কাছ থেকে হাত চারেক তফাতেই আবার কে ফাঁচ-ফাঁচ-ফাঁচ করে তিন-তিনবার হেঁচে উঠল।

অবলাকান্তের মুখ সাদা হয়ে গেল। বিড়বিড় করে তিনি বললেন, এ কে হচে? আকাশ, না বাতাস, না পাহাড়? না যক্ষ রক্ষ দেবতা দানব? এরকম হাঁচি তো ভালো নয়? এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি কবিতার খাতা মুড়ে ফেলে শ্রীপুরের দিকে দ্রুত পদ-চালনা করলেন।

.

অষ্টম। বাবু বংশীবদন বসু

কেউ তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, আমার নাম বাবু বংশীবদন বসু। পাছে তিনি আমাদের উপরে রাগ করেন, সেইজন্যে আমরাও তাকে বংশীবাবু বলেই ডাকব।

বংশীবাবুর ভোজন হয় যত্র-তত্র, আর শয়ন হয় হট্টমন্দিরে, তারপরে যে-সময়টুকু হাতে থাকে হাটে-ঘাটে-মাঠে টো-টো করে ঘুরে, বংশীবাবু সে-সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারেন অনায়াসেই।

মস্ত মাঠ। একটা বটগাছের ছায়ায় নরম ঘাসের উপরে বংশীবাবু দুপা ছড়িয়ে বসেছিলেন। তাঁর সামনে সাজানো ছিল সারি সারি চার জোড়া ছেঁড়া জুতোর পাটি।

বংশীবাবুর সম্প্রতি পায়ের জুতোর অভাব হয়েছে। কিন্তু সে অভাব পূরণ করতে তাঁর বেশিক্ষণ লাগেনি। শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই চার জোড়া ছেঁড়া জুতো তিনি আজ সংগ্রহ

করে এনেছেন। আর এখন বসে বসে পরীক্ষা করছেন, এই চার জোড়া জুতোর মধ্যে কোন জোড়া সবচেয়ে ছেঁড়া!

হঠাৎ কে পিছন থেকে বললে, ওগুলো, জুতো বুঝি? বংশীবাবু পিছনে না তাকিয়েই বললেন, হ্যাঁ এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহই নেই। এগুলি হচ্ছে দাঁতব্য জুতো। এর চেয়ে খারাপ চার জোড়া জুতো দুনিয়াতে কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না।

পিছনের লোকটি বললে, হুঁ।

বংশীবাবু বললেন, অবশ্য এর চেয়েও খারাপ জুতো যে আমি পরিনি তা নয়, কিন্তু তবু, সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এ-শহরে যারা জুতো দান করে তারা খুব দয়ালু লোক নয়!

পিছনের লোকটি বললে, দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে পাজি লোক, এ-শহরে বাস করে তারাই।

কে এতটা স্পষ্ট কথা কইছে দেখবার জন্যে বংশীবাবু ডান কাঁধের উপরে মুখ ফিরিয়ে পিছন-পানে তাকালেন। সেদিকে, কেউ নেই। তারপর তিনি বাঁ কাঁধের উপরে মুখ ফিরিয়ে পিছন পানে তাকালেন। সেদিকেও কেউ নেই। তারপর তিনি একেবারে ঘুরে বসলেন। কোথাও কেউ নেই।

বংশীবাবু নিজের মনে বললেন, আমি কি জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছি?

সেই কণ্ঠস্বর বললে, ভয় পেও না।

বংশীবাবু আঁতকে উঠে বললেন, কে তুমি বাবা? কোথায় তুমি? কেউ কি তোমাকে মাটির ভেতরে পুঁতে রেখে গিয়েছে?

কণ্ঠস্বর আবার বললে, ভয় পেও না।

হতভম্ব বংশীবাবু বললেন, বল কি বাবা, ভয় পাব না কীরকম? উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব পশ্চিম সব খাঁ-খাঁ করছে। এই তেপান্তরে আমি আছি একলা। অথচ এখানে এসে তুমি কথা কইছ কোনখান থেকে?…না, তুমি বোধ হয় নেই! কাল রাতে সিদ্ধি খেয়েছিলুম, এখনও নেশা কাটেনি। ভুল শুনছি।

কণ্ঠস্বর বললে, না, এ নেশা নয়।

বাপ রে। বলেই এক লাফে বংশীবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন। একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে পিছু হটতে হটতে বললেন, না নিশ্চয়ই আমার নেশা কাটেনি! দিব্যি গেলে বলতে পারি, আমি এখুনি কার গলা শুনলুম!

কণ্ঠস্বর বললে, হ্যাঁ, তুমি আমারই গলার আওয়াজ শুনেছ।

ভয়ে দুই চোখ মুদে ফেলে বংশীবাবু বললেন, আর কখনও আমি সিদ্ধি খাব না।

হঠাৎ কে তার দুই কঁধ ধরে খুব খানিকটা আঁকুনি দিয়ে বললে, তুমি একটা মস্ত গাধা।

বংশীবাবু চোখ না খুলেই বললেন, আমি গাধা হতেও রাজি আছি বাবা, তুমি যদি দয়া করে চুপ করো। এখন যদি রাত হত তাহলে এসব ভূতেরই খেলা বলে মনে করতুম।

কণ্ঠস্বর বললে, ওহে বোকারাম, আমি ভূত-টুত কিছু নই,আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ।

বংশীবাবু চোখ খুলে বললেন, অদৃশ্য মানুষ? না নেশার খেয়াল?

কণ্ঠস্বর বললে, নেশার খেয়াল নয়, আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ!

তুমি যে অদৃশ্য সেটা আমি বুঝতেই পারছি বাবা! কিন্তু তুমি কোন মন্ত্রে অদৃশ্য হয়েছ সেটা আমাকে শিখিয়ে দিতে পারো?

পারি। যদি তুমি আমার কথা শোনো।

ও-মন্ত্র পেলে তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

দেখ, আমিও তোমার মতন ভবঘুরে। আমি অসহায়। আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। সারাদিন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলছে। মানুষ পেলেই এখুনি আমি খুন করতে পারি!

বাবা! বলেই বংশীবাবু পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন!

খপ করে বংশীবাবুর একখানা হাত ধরে অদৃশ্য মানুষ বললে, তোমার কোনও অনিষ্টই আমি করব না! আমি জামা-কাপড় চাই, আশ্রয় চাই, খোরাক চাই। এই-সব বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করবে!

বংশীবাবু ভাবতে লাগলেন, যার নিজের পরনের কাপড়, পেটের অন্ন আর মাথা গোঁজবার ঠাঁই জোটে না, এইসব বিষয়ে সে কিনা সাহায্য করবে অপরকে! কিন্তু ভয়ে মনের কথা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারলেন না!

কণ্ঠস্বর বললে, আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ–সমস্ত পৃথিবীকে আমি শাসন করতে পারি। আমাকে সাহায্য করলে তোমার কোনও অভাবই থাকবে না! কিন্তু সাবধান, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে পৃথিবীতে কেউ তোমাকে রক্ষে করতে পারবে না! বলতে বলতে সে। তার অদৃশ্য দুই হাত দিয়ে বংশীবাবুর দুখানা হাত সজোরে চেপে ধরলে।

বংশীবাবু যাতনায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, ছেড়ে দাও বাবা! আমি তোমার গোলাম থাকব!

.

নবম । নোট প্রজাপতি

শ্রীপুরের স্বাস্থ্যনিবাসে সকালে-বিকালে চা, টোস্ট, কেক, বিস্কুট ও ডিম প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। শ্রীপুরের যে-কোনও ভদ্রলোকই কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করলে সেখানে গিয়ে চায়ের তৃষ্ণা

নিবারণ করতে পারতেন। এবং প্রতিদিন সকালে-বিকালেই সেখানে চায়ের তেষ্টা মেটাবার জন্যে অনেক তৃষিত লোকের আবির্ভাব হত।

যাত্রীর অন্তর্ধানের পরের দিন সকালেও স্বাস্থ্যনিবাসের চা-বিভাগে চা-ভক্তদের অভাব হল না।

একটা মস্ত গোল টেবিলের চারিধারে বসে খরিদ্দাররা মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে গতকল্যকার ঘটনা নিয়ে উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছেন। বলা বাহুল্য চা-সভার সভাপতি ছিলেন স্বাস্থ্যনিবাসের মালিক মিস্টার দাস স্বয়ং এবং তাঁর ডাইনে ও বাঁয়ে বিরাজ করছিলেন রতনবাবু ও মানিকবাবু। আসল বক্তা হচ্ছেন তারা তিন জনই, বাকি সবাই শ্রোতা ও উৎসাহদাতা।

বক্তৃতা যখন রীতিমতো জমে উঠেছে, তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন একটি নতুন লোক। তার জামা কাপড় যে হপ্তাকয়েকের মধ্যে রজকের দেখা পায়নি, এ সত্য খুব সহজেই বোঝা যায়। তাঁর ধুলোয় ধূসর তালিমারা জুতো-দুখানির অবস্থাও সন্দেহজনক; কারণ তাদের ভিতরে ভদ্রলোকের পা-দুখানি ঢুকেও আরও খানিকটা বেওয়ারিস জায়গা খালি পড়ে আছে। ভদ্রলোক আসতে আসতে ক্রমাগত পিছনপানে চেয়ে চমকে উঠছেন—যেন তার পিছনে পিছনে আসছে কোনও অদৃশ্য বিপদ!

স্বাস্থ্যনিবাসের খরিদ্দারের এমনধারা হতচ্ছাড়া চেহারা মিস্টার দাস পছন্দ করলেন না। একটু বিরক্ত ভাবে বললেন, এখানে আপনার কী দরকার?

আগন্তুক বললেন, এক পেয়ালা চা আর দু-টুকরো রুটি চাই। গোটাদুয়েক ডিম হলে আরও ভালো হয়।

আগন্তুকের ছেঁড়া পকেটের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে মিস্টার দাস বললেন, দাম চার আনা। আপনাকে, খাবার আগে দাম দিতে হবে।

মিস্টার দাসের ভয়ের কারণ বুঝে আগন্তুক হেসে বললেন আমার পকেট ছেঁড়া বটে, কিন্তু আমার টাকা থাকে ট্যাকে। এই নিন। বলে তিনি ট্র্যাক থেকে একটা টাকা বার করে ঠং করে টেবিলের উপরে ফেলে দিলেন।

মিস্টার দাস অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আসুন, আসুন, ওই টেবিলের ধারে বসুন। আপনার খাবার এখুনি আসবে। বলেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, ডাক্তারবাবু, এইবারে সেই ভূতুড়ে লোকটার ঘরে যাওয়া যাক।

মিস্টার দাসের সঙ্গে মানিকবাবু স্বাস্থ্যনিবাসের ভিতরদিকে চলে গেলেন। আগন্তুক টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। কারুকে বোধহয় বলে দিতে হবে না যে এই আগন্তুকই হচ্ছেন, আমাদের সেই বংশীবাবু।

মিস্টার দাস ও মানিকবাবু যাত্রীর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, কালকের সেই তুমুল কাণ্ডের পর ঘরের সমস্ত আসবাব ঠিক সেইভাবেই এলোমেলো হয়ে ছড়ানো রয়েছে। ওলটানো চেয়ার-টেবিল, ভাঙা-চোরা শিশিবোতল ও লণ্ডভণ্ড বিছানা! কেবল যাত্রীর জামা-কাপড়, ব্যান্ডেজ, চশমা ও নকল নাকটা দারোগাবাবু যাওয়ার সময় নিজের সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ঘরের কোণে একখানা পকেটবুক পড়েছিল, সেইখানা তুলে নিয়ে মিস্টার দাস বললেন, এই পকেট বইখানার পাতা ওলটালে লোকটার অনেক কথাই হয়তো জানা যাবে!

মানিকবাবু কি জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

মিস্টার দাস চমকে উঠে বললেন, ওকি, দরজা খুললে কে?

মানিকবাবু দরজার দিকে চেয়ে খুব সহজ ভাবেই বললেন, বোধ হয় হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেল। এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

মিস্টার দাস বললেন, কালকের ব্যাপারের পর থেকে অমন ভাবে দরজা খুলে গেলেই আমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে!

ঘরের ভিতরে একটা চাপা হাঁচির শব্দ শোনা গেল।

মিস্টার দাস বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনি কি এখনি হাঁচলেন?

ঘরের মধ্যে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল–না, আমি হেঁচেছি। আমাকে আপনারা চেনেন।

মিস্টার দাস ও মানিকবাবু হতাশ ভাবে ও মড়ার মতন সাদা মুখে দুদিকে সরে গিয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালেন।

কণ্ঠস্বর বললে, মিস্টার দাস, আমার পকেটবুক আপনার হাতে কেন? দিন, ফিরিয়ে দিন।

মিস্টার দাস কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে পকেটবুকখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

পকেটবুক খানা মিস্টার দাসের হাত থেকে বেরিয়ে শুন্যে উড়ে একখানা চেয়ারের উপর গিয়ে পড়ল।

কণ্ঠস্বর বললে, মিস্টার দাস, আমার জামাকাপড়গুলো কোথায় গেল?

মিস্টার দাস বললেন, পুলিশ নিয়ে গেছে।

কণ্ঠস্বর বললে, আমার আর জামা-কাপড় নেই। তবে আপাতত আপনার জামা-কাপড় পেলেই আমার চলে যাবে। আপনার গায়ের আলোয়ানখানা খুলে মেঝের ওপরে রাখুন। তারপর আপনার জামা, কাপড় আর জুতো সব খুলে ওই আলোয়ানের ভেতরে রেখে দিন। তারপর একটা পোটলা বেঁধে জিনিসগুলো আমার হাতে দিন।

মিস্টার দাস আঁতকে উঠে বললেন, আঁ, সে কি কথা!

কণ্ঠস্বর খুব কর্কশ ভাবে বললে, যা বলছি তাই করুন। দেখতে পাচ্ছেন, আমি অদৃশ্য? আমি যদি ইচ্ছা করি, তা হলে এখনি আপনাদের দুজনকে গলা টিপে, মেরে ফেলতে পারি!

মিস্টার দাস বাধো বাধো গলায় অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে বললেন, কিন্তু এ-ঘরে ডাক্তারবাবুর সামনে আমি জামাকাপড় খুলব কেমন করে?

কণ্ঠস্বর বললে, আমি অদৃশ্য বটে, কিন্তু আপনাদের চেয়ে বোকা নই। একবার চোখের আড়ালে যেতে পারলেই আপনি যে এখুনি পুলিশে খবর দিতে ছুটবেন, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ওসব চালাকি চলবে না। যা বলছি তাই করুন।.আর মানিকবাবু, ওই বইগুলো গুছিয়ে তুলে আপনিও এই পোঁটলার ভেতরে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করুন।

.

বাইরে তখন বংশীবাবুর চা, রুটি ও ডবল ডিম শেষ হয়ে গেছে।

এমন সময় রতনবাবু শুনতে পেলেন, যাত্রীর ঘর থেকে যেন একটা গোলমালের আভাস আসছে। দিনকাল ভালো নয় বলে তিনিও তাড়াতাড়ি উঠে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন।

সিঁড়ির সামনে এসেই তিনি শুনলেন, তার খুব কাছেই একটা হাঁচির শব্দ হল। এ হাঁচি তিনি ভোলেননি। শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

তার পরেই দেখলেন, সিঁড়ির উপর থেকে একটা পোটলা শূন্যে দুলতে দুলতে নেমে আসছে!

পোঁটলাটা ঠিক যেন হাওয়ায় সাঁতার কাটতে কাটতে বৈঠকখানা-ঘরের দিকে চলে গেল।

ঠিক সেই সময় মিসেস দাস কি-একটা কাজের জন্যে বৈঠকখানা-ঘরের দিকে আসছিলেন। কিন্তু দূর থেকেই উড্ডীয়মান পোঁটলা দেখে তার চক্ষু স্থির ও পা দুটো অচল হয়ে গেল। তার পরেই বাইরের ঘরে একটা অত্যন্ত গোলযোগ উঠল!

সঙ্গে সঙ্গে মানিকবাবু যাত্রীর ঘর থেকে বেগে বেরিয়ে এসে বলে উঠলেন, অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ! ধরো যতক্ষণ ওর হাতে পোটলা থাকবে সবাই মিলে অনায়াসেই ওকে ধরতে পারবে!

রতনবাবু বেগে বৈঠকখানায় প্রবেশ করে দেখলেন, বংশীবাবু পোঁটলাটা কাঁধে করে দ্রুতপদে স্বাস্থ্যনিবাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন! অদৃশ্য মানুষ নির্বোধ নয়, নিজে পোঁটলা নিয়ে যেতে গেলে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা সে বিলক্ষণই জানে! তাই বংশীবাবুকেই সে পোটলার বাহন করেছে!

রতনবাবুও বংশীবাবুর পিছনে ছুটতে ছুটতে চাঁচাতে লাগলেন, চোর! চোর! পোটলা নিয়ে পালায়! পাকড়াও পাকড়াও!

বেচারী বংশীবাবু! খানিক পরেই তিনি দেখলেন, সারা শ্রীপুর শহরটাই যেন তার পিছনে ভেঙে পড়েছে। সকলেরই মুখে এক কথা–চোর! চোর! পোটলা চোর! ধরো ওকে-মারো ওকে! এসব আপত্তিকর কথা শুনে বংশীবাবু আরও জোরে পা চালিয়ে দিলেন। ছোটবার অসুবিধা হবে বলে তার দাঁতব্য জুতো-জোড়াকেও তিনি পা থেকে খুলে নির্দয় ভাবে বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন।

সকলের আগে আসছিলেন রতনবাবু ও মানিকবাবু। হঠাৎ রতনবাবুর মনে হল, কে যেন তাকে বিশ্রী একটা ল্যাং মারলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে দু-হাতে মাটি জড়িয়ে ধরলেন।

তারপরেই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন মানিকবাবুর টিকলো নাকের উপরে প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়ল। মানিকবাবু দুই চক্ষে অনেকগুলো সর্ষের ফুল দেখলেন–এবং তারপর কি যে হল তা আর তিনি বলতে পারেন না।

আর যারা ছুটে আসছিল, তাদেরও কেউ খেলে কিল, কেউ খেলে চড় এবং কেউ বা খেলে লাথি বা গলাধাক্কা! বেগে ছুটতে ছুটতে আছাড় খেয়ে অনেকেরই হাত-পা-মাথা ভেঙে গেল! বাকি লোকেরা তখন বুদ্ধিমানের মতো যে যেদিকে পারল পলায়ন করলে– এই কথা বলে চাঁচাতে চাঁচাতে–অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ আবার ফিরে এসেছে! সকলে সাবধান হও! এই ভয়ানক খবর শুনেই অনেকে নিজের নিজের বাড়ির সদর দরজায় ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে দিলে।

শ্রীপুরের সবাই যখন রাজপথে, মিস্টার দাস তখন যাত্রীর ঘরের ভিতরে বন্দি হয়ে আছেন। রাজপথের ও স্বাস্থ্যনিবাসের সমস্ত হট্টগোল ও আর্তনাদ তার কানে এসে ঢুকছে, কিন্তু মিস্টার দাসের ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই কারণ তখন তিনি সদ্যপ্রসূত শিশুর মতোই বস্ত্রহীন! অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি যখন খানকয়েক খবরের কাগজ তুলে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিজের বস্ত্রের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন, তখন রতনবাবু আবার হাপরের মতন হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এলেন।

ঘরে ঢুকেই রতনবাবু বলে উঠলেন, অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য ঘুষি! অদৃশ্য লাথি! সমস্ত শ্রীপুরের গতর চূর্ণ হয়ে গেছে!

মিস্টার দাস ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, সে এখন কোথায়?

এতক্ষণ আমরা তার পিছনে পিছনে ছুটছিলুম, কিন্তু এখন আমাদেরই পিছনে পিছনে সে ছুটে আসছে! হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে মেরে তার হাড় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সবাই এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে–অদৃশ্য মানুষ বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে!

ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মিস্টার দাস বললেন, সে আর এখানে ফিরে আসবে না তো?

আসবে না কি, ওই এল বুঝি! এই বলেই সাঁতারুরা গঙ্গায় যেমন করে ঝাঁপ খায়, রতনবাবু তেমন করেই মাটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে খাটের তলায় ঢুকে অদৃশ্য মানুষের চেয়েও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মিস্টার দাসও কোমরের খবরের কাগজগুলোকে দুই হাতে প্রাণপণে চেপে ধরে দরজার বাইরের দিকে সুদীর্ঘ একটি লম্ফত্যাগ করলেন;–এবং লাফিয়ে তিনি যে কোথায় গিয়ে পড়লেন তা আমরা জানি না, তবে তাকেও আর দেখা গেল না।

.

সারাদিন ধরে শ্রীপুর শহরে যে সব অঘটন ঘটল, চতুর্মুখ ব্রহ্মা চারমুখেও তা বলে শেষ করতে পারবেন না।

রাজপথে কেউ হাঁচলেই চারিদিকে অমনি সাড়া ওঠে ওই অদৃশ্য মানুষ এসেছে! সঙ্গে সঙ্গে সেখানটা মরুভূমির মতন জনশূন্য হয়ে যায়!

বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে থেকেও শান্তি নেই! হাওয়ার দাপটে ঘরের দরজা-জানলা যদি হঠাৎ খুলে বা বন্ধ হয়ে যায়, অমনি সবাই হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে!

শ্রীপুর ব্যাঙ্কের কাউন্টারের উপরে হাজার কয়েক টাকার নোট নিয়ে একজন কেরানি হিসাব করছিল। আশপাশে আরও অনেক লোক আপন আপন কাজে নিযুক্ত ছিল। এমন সময় দেখা গেল, সকলের চোখের সুমুখ দিয়েই নোটের তাড়া শূন্যপথে উড়ে গেল–ঠিক প্রজাপতির মতন। সবাই রাজপথে ছুটে এল কিন্তু সেই নোট-প্রজাপতিদের আর কোনও সন্ধান পেলে না, কেবল দেখা গেল, একজন ময়লা জামা-কাপড়-পরা লোক খালি পায়ে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে!

স্বাস্থ্যনিবাসের উপরে অদৃশ্য মানুষের আক্রোশ অত্যন্ত বেশি। কারণ, সারাদিনে সে বার চারেক স্বাস্থ্যনিবাসকে আক্রমণ করেছে, সেখানকার একখানা সার্সির কাচও অটুট নেই, এবং কাচের সমস্ত বাসনও চুরমার হয়ে গেছে! স্বাস্থ্যনিবাসের ভাড়াটিয়ারা প্রত্যেকেই পলায়ন করেছে।

খবরের কাগজে এই সব ঘটনার উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠ করে শ্রীপুরের বাসিন্দাদের উত্তেজনা, দুর্ভাবনা ও বিভীষিকার আর সীমা রইল না।

কখন কোথায় এই ভীষণ অদৃশ্য মানুষের অদৃশ্য আবির্ভাব ঘটবে, সেই দুশ্চিন্তায় সকলেই তটস্থ হয়ে রইল।

যে-মাঠে বংশীবাবুর সঙ্গে প্রথমে আমাদের চেনাশুনো হয়, সেই ধূ-ধূ মাঠেরই এক নির্জন কোণে একটা ঝোপের ভিতরে তিনি এখন আবার হতাশ ভাবে দুপা ছড়িয়ে বসে ঘন ঘন হাঁপ ছাড়ছেন। এবং মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে কেন যে তিনি শিউরে উঠছেন অন্য কেউ তার রহস্য বুঝতে পারবে না।

হঠাৎ শূন্যপথে দৈববাণীর মতো এক কণ্ঠস্বর জেগে উঠল,–বংশীবদন, তোমার হাঁপ ছাড়া শেষ হল কি? সন্ধে হতে যে আর দেরি নেই!

বংশীবাবুর বদলে কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না। অত্যন্ত কাহিল ভাবে তিনি বললেন, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন আপনার দুটি পায়ে পড়ি!

কণ্ঠস্বর বললে, সে কি হে বংশীবদন! ব্যাঙ্কের কাউন্টার থেকে, রাস্তার লোকের পকেট থেকে আজ কত নোট আর টাকা তোমার পকেটে এসে জুটেছে সেটা হিসেব করে দেখেছ কি? আমার সঙ্গে থাকলে রোজই এমনি আশ্চর্য রোজগার হবে। অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার।

বংশীবাবু দুই হাত জোড় করে কঁচুমাচু মুখে বললেন, আমার আশ্চর্য রোজগারে আর কাজ নেই বাবা! এত রোজগার আমার ধাতে সইবে না! এর চেয়ে গড়ের মাঠের মতন ট্যাক নিয়ে নিশ্চিন্ত প্রাণে ঘুরে বেড়ানো ঢের ভালো। রোজগার করে করব কি, সারা শহর যে আমাকে চিনে ফেলেছে। পথে-পথে পাহারাওয়ালা ঘুরছে আমার গলা টিপে ধরবার জন্যে। আপনি তো অদৃশ্য হয়ে দিব্যি মজায় আছেন কিন্তু আমার? আমার কি হবে?

লোকটা বললে, কেমন করে তাকে দেখিয়ে দেব? সে যে অদৃশ্য মানুষ! সে আমার পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে। আমাকে বাঁচাও।

হঠাৎ পাহারাওয়ালার দাড়ি-ভরা গালে চটাৎ করে এক নিরেট চড় এসে পড়ল। গালে হাত বুলোতে বুলোতে হতভম্ব পাহারাওয়ালা দু-পা পিছিয়ে এল। তারপরেই বিস্ময়ে দেখলে, তার সামনের লোকটাকে কে যেন হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কে যে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখবার জো নেই!

পাহারাওয়ালা এক লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে দুহাতে লোকটার দুই-পা খুব জোরে চেপে ধরলে, তারপর একদিকে পাহারাওয়ালা ও আর-একদিকে অদৃশ্য মানুষ, এই দুয়ে মিলে টাগ অফ ওয়ার লেগে গেল সেই হতভাগ্য লোকটার দেহ নিয়ে।

গোলমাল শুনে ফাঁড়ির দারোগা বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, এসব কী কাণ্ড!

পাহারাওয়ালা টানাটানি করতে করতে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, অদৃশ্য মানুষ।

যার দেহ নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে সেই লোকটি অর্থাৎ আমাদের বংশীবাবু যাতনায় বিকৃত স্বরে বলে উঠলেন, আমাকে বাঁচাও। আমার দেহ এইভাবে ছিঁড়ে দুখানা হয়ে যাবে!

দারোগা রিভলভার বার করে কয়েকবার গুলিবৃষ্টি করলেন। গুলি অদৃশ্য মানুষের গায়ে লাগল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু বংশীবাবুর দুই হাত থেকে অদৃশ্য মানুষের হাতের বাঁধন ফস করে খুলে গেল!

.

দশম । পূর্ণ-বিধু সংবাদ

রসায়নশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীপুর শহরে বাস করতেন। আজ সারাদিন তাঁর অশান্তির অবধি নেই।

আজ সারাদিন শ্রীপুরের পথে হট্টগোল ও হুড়োহুড়ি চলেছে, তার জন্যে পূর্ণবাবুর সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। সারাদিনই তার কানের ভিতরে এই চিৎকারই বারবার ছুটে এসেছে অদৃশ্য মানুষ। অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ! ওই আসছে! ওই ধরলে!

পূর্ণবাবুও বারবার বিরক্তিভাবে নিজের মনেই বলছেন, পৃথিবীতে আবার কি রূপকথার রাজ্য ফিরে এল? অদৃশ্য মানুষ! সারা দুনিয়াটা কি হঠাৎ পাগলা হয়ে গেল?

সন্ধ্যার পরে শহর যখন ঠান্ডা হল ও রাজপথের জনতা কমে গেল, পূর্ণবাবু তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে বসলেন। রাত যখন দুপুর তখনও তিনি কাজ করছেন একমনে।

আচমকা কি কতকগুলো ভাসা-ভাসা চিৎকার ও রিভলভারের শব্দ তার কানে এসে ঢুকল। কাজ করতে করতে মুখ তুলে পূর্ণবাবু বললেন, আবার কি গাঁজাখোরদের উপদ্রব শুরু হল? কিন্তু রিভলভার ছুঁড়েছে কে? তারপর, আবার তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই খুব জোরে তার সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। তারপর দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজ এল তার কানে।

চাকরকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে কড়া নাড়ছিল!

চাকর বললে, জানি না হুজুর! দরজা খুলে কারুকে তো দেখতে পেলুম না।

চাকর চলে গেল। পূর্ণবাবু আবার কাজ করতে লাগলেন।

রাত দুটোর সময় তাঁর কাজ শেষ হল। ধীরে ধীরে টেবিলের ধার থেকে উঠে তিনি তার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই একখানা চেয়ারের তলায় কি-একটা দাগ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, খানিকটা রক্ত! আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, এখানে রক্তের দাগ এল কেমন করে? কিন্তু একটানা পরিশ্রমের পর তার চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছিল, এসব বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি শয্যার দিকে আবার অগ্রসর হলেন। ঘুমের ঘোরে সে রাত্রে তিনি ক্ষুধার কথাও ভুলে গেলেন।

কিন্তু খাটের কাছে গিয়ে তিনি যা দেখলেন, তাতে তার বিস্ময় আরও বেড়ে উঠল। তাঁর সমস্ত শয্যা লণ্ডভণ্ড ও বিছানার চাদর ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে এবং তাতেও রক্তের দাগ রয়েছে! এ কী রহস্য!

অবাক হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল কী আশ্চর্য! এ যে পূর্ণ!–পূর্ণবাবু একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, ঘরে তিনি ছাড়া আর জনপ্রাণী নেই! কণ্ঠহীন কণ্ঠস্বর? শ্রীপুরের পাগলামি তাকেও আক্রমণ করল নাকি! ধেৎ!

হঠাৎ একখানা চেয়ারের দিকে তাঁর নজর পড়ল। চেয়ার থেকে ঠিক আধ হাত উপরে শুন্যে একটা ব্যান্ডেজ স্থির হয়ে আছে–আর তাতেও রক্তের দাগ। গোল ব্যান্ডেজ কিন্তু তার ভিতরে কোনও বস্তু বা দেহের কোনও অংশ নেই! এও কি সম্ভব! পূর্ণবাবুর কিছুমাত্র কুসংস্কার ছিল না, কিন্তু এ-দৃশ্য দেখবার পর তারও বুকের কাছটা ছমছম করতে লাগল!

ঘরের ভিতর আবার কে তাকে ডেকে বললে, পূর্ণ! তুমি এখানে!

বিপুল বিস্ময়ে পূর্ণবাবু হাঁ করে রইলেন!

কণ্ঠস্বর বললে, পূর্ণ, ভয় পেও না! আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ!

শ্রীপুরের পাগলামি তার শয়ন-ঘরেও ঢুকেছে? না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখছেন? স্বপ্নের ঘোরেই তিনি যেন বললেন, আঁ?

কণ্ঠস্বর আবার বললে, আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ!

নিজের কানকে অবিশ্বাস করেও পূর্ণবাবু বললেন, অদৃশ্য মানুষ? অদৃশ্য মানুষকে দেখতে কি ওই ব্যান্ডেজের মতো?

কণ্ঠস্বর বললে, না। ব্যান্ডেজটা আমার কোমরে বাঁধা আছে। তোমার বিছানার চাদর ছিঁড়ে এই ব্যান্ডেজ তৈরি হয়েছে।

পূর্ণবাবু ভাবলেন, অদৃশ্য মানুষ যদি সত্যিকার মানুষই হয়, তাহলে অত্যন্ত অভদ্র তো! সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও তাকে তুমি তুমি বলে কথা কইছে!

কিন্তু এ সবই বাজে ধাপ্পা! ম্যাজিকের ফকিকারিতে তাকে ভোলানো এত সহজ নয়! সামনে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে তিনি ব্যান্ডেজটা ধরবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ দু-খানা তপ্ত রক্তমাংসের হাত তার হাত সজোরে চেপে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর বললে, পূর্ণ, বিশ্বাস। করো। সত্যিই আমি অদৃশ্য মানুষ!

এইবারে পূর্ণবাবুর গায়ে কাঁটা দিলে তিনি চেঁচিয়ে লোকজন ডাকবার উপক্রম করলেন এবং তৎক্ষণাৎ দু-খানা অদৃশ্য হাত সজোরে তার মুখ চেপে ধরলে!

পূর্ণ, বোকামি কোরো না। চাঁচামেচি করলে তোমার ভালো হবে না। আমার গলা শুনেও তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি হচ্ছি বিধু!

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পূর্ণবাবু বললেন, বিধু?

হ্যাঁ, হ্যাঁ–বিধু, অর্থাৎ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিটি কলেজে তোমার সঙ্গে পড়তুম– মনে নেই, দিনে তিরিশ কাপ করে চা খেতুম বলে তুমি আমাকে কেবলই ধমক দিতে? আশ্চর্য, এত শীঘ্র তুমি বন্ধুদের ভুলে যাও!

পূর্ণবাবু আমতা আমতা করে বললেন, বিধু? হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে! কিন্তু অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সেই বিধুর কি সম্পর্ক? সে তো অদৃশ্য ছিল না!

না, তখন আমি অদৃশ্য ছিলুম না। এখন হয়েছি।

এও কি সম্ভব? মানুষ অদৃশ্য হতে পারে?

সে আলোচনা পরে করব। আপাতত আমায় কিছু খেতে দাও–আজ তিন দিন আমার পেটে অন্ন যায়নি।

পূর্ণবাবু বললেন, আজ আমার খিদে নেই বলে আমি কিছু খাইনি। আমার খাবার তোমার পাশের টেবিলেই চাপা দেওয়া আছে। ইচ্ছে করলেই খেতে পারো।

নিরাকার বিধুর আর তর সইল না–পূর্ণবাবু অবাক হয়ে দেখলেন তার টেবিলের উপরে রক্ষিত খাবারের থালার ঢাকনিটা হঠাৎ যেন জ্যান্ত হয়ে এক লাফ মেরে টেবিলের আর-এক পাশে গিয়ে পড়ল এবং তারপর খাবারগুলোও জ্যান্ত হয়ে শূন্যে টপাটপ লাফ মারতে শুরু করলে!

খেতে খেতে নিরাকার বিধু বললে, আঃ, এতক্ষণে যেন বাঁচলুম! আমি ঈশ্বরের মতো নিরাকার হয়েছি বটে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে এখনও জয় করতে পারিনি। ভাগ্যিস দৈবগতিকে তোমার বাড়িতেই এসে পড়েছি!

তোমার দেহ নিরাকার হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার দেহের রক্ত তো চর্মচক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে না! ব্যাপার কী? তুমি আহত হয়েছ কেন?

সে অনেক কথা, পরে বলব। আপাতত এইটুকু শুনে রাখো, একটা পাজি লোক আমার টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল, তাকে ধরতে গিয়েই, আমার এই বিপদ হয়েছে।...ভাই পূর্ণ, আজ আর আমি কথা কইতে পারছি না–তিন দিন আমি ঘুমোই নি, আমাকে ঘুমোবার একটু ঠাই দাও।

তুমি এই ঘরেই ঘুমোতে পারো, আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি।

আর তোমার দু-একটা বাড়তি জামাকাপড় আমাকে দিয়ে যাও।

আচ্ছা।

.

একাদশ । নিরাকারের আত্মকথা

পূর্ণবাবু একখানা আলোয়ান, একটা গরম কোট, একটা ফ্লানেলের শার্ট, একখানা কাপড় ও একজোড়া জুতো এনে দিলেন।

বিধু যখন সেইগুলো পরলে, তখন তার দেহের একটা নির্দিষ্ট গঠন পূর্ণবাবুর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল–যদিও জামার উপরে তার মুণ্ড, জামার হাতার তলায় তার হাত দুটো এবং হাঁটুর কাপড় ও জুতোর মাঝখানে তার পা-দুটো দৃশ্যমান হল না বলে সে দেহটাকে অত্যন্ত কিম্ভুতকিমাকার দেখাতে লাগল।

বিধু বললে, ভাই পূর্ণ, এইবারে আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। বাকি কথা সব কাল সকালে হবে।...হ্যাঁ, ভালো কথা। আমি এখানে আছি একথা তুমি কারুকে বলবে না তো?

কেন?

লোকে আমার কথা টের পায়, এটা আমি পছন্দ করি না! সাবধান, আমার একথা ভ্রমেও ভুলো না!

পূর্ণবাবু সে-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে অন্য একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তার চোখে সে রাত্রে আর ঘুম এল না। একখানা ইজিচেয়ারের উপরে বসে পড়ে তিনি নানা কথা ভাবতে লাগলেন।

অদৃশ্য মানুষ! শ্রীপুরের আর সকলের মতো আমারও মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এও কি সম্ভব? হ্যাঁ, সমুদ্রের জলে যারা বাস করে, আমাদের চোখে তারা অদৃশ্য বটে! পুকুরের জলে যে-সব জীব বাস করে, তারাও অদৃশ্য! কিন্তু পৃথিবীর হাওয়ার জগতে যারা বাস করে, তারা কখনও অদৃশ্য হতে পারে না!

ভেবে-চিন্তেও তিনি কুলকিনারা পেলেন না।..রাত পুইয়ে গেল। সকালবেলায় খবরের কাগজ এল। খবরের কাগজে পূর্ণবাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অদৃশ্য মানুষের সমস্ত কীর্তিকলাপ পড়ে ফেললেন। যে-কথাগুলি তিনি জানতে পারলেন, সেগুলি হচ্ছে এই :

(১) অদৃশ্য মানুষ স্বাস্থ্যনিবাসের উপরে বিষম অত্যাচার করেছে। (২) অদৃশ্য মানুষ ডাক্তার মানিকবাবুর বাড়ি থেকে টাকা চুরি করেছে। (৩) অদৃশ্য মানুষ শ্রীপুরের অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষকে আহত করেছে। (৪) অদৃশ্য মানুষ শ্রীপুরের ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার টাকার নোট নিয়ে পালিয়েছে এবং রাজপথের পথিকদের পকেট কেটে অনেক টাকা সরিয়েছে! প্রভৃতি।

পূর্ণবাবু নিজের মনেই বললেন, সর্বনাশ। বিধু কেবল অদৃশ্য নয়, উন্মত্তও বটে! ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে সে সাংঘাতিক কাণ্ডও করতে পারে। মানুষের সমাজের সমস্ত নিয়ম বদলে দিতে পারে! আর আমি কিনা তাকে স্বাধীনভাবে আমারই ঘরে ছেড়ে রেখে এসেছি! তাকে কি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? কখনওই নয়।

পূর্ণবাবু একখানা কাগজে তাড়াতাড়ি কি লিখলেন। তারপর কাগজখানা একখানা খামের ভিতরে পুরে চাকরকে ডেকে বললেন, এই চিঠিখানা চুপিচুপি থানায় দিয়ে এসো।

ঠিক সেই সময়েই তার শয়ন-ঘরের ভিতরে ঝনঝন করে একটা বেজায় আওয়াজ হল– যেন কাচের কি কতগুলো ভেঙে পড়ল! পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি শয়ন ঘরের দিকে ছুটলেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলেন, একটা জানলার সামনে বিধুর স্কন্ধকাটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং জানলার সার্সির ভাঙা কাচগুলো ঘরের মেঝের উপর ছড়িয়ে রয়েছে!

পূর্ণবাবু বললেন, এ কী ব্যাপার?

বিধু বিরক্তমুখে বললে, আমার মেজাজ বেজায় তিক্ত হয়ে আছে! কিছুই ভালো লাগছে না। ভয়ানক রাগ হচ্ছে। রাগের ঝোঁকে তোমার সার্সির কাচগুলো ভেঙে ফেলেছি!

পূর্ণবাবু মনে মনে বললেন, উন্মাদ রোগের পূর্বলক্ষণ! প্রকাশ্যে বললেন, তুমি আজকাল মাঝে মাঝে এইরকম করো নাকি?

করি।

পূর্ণবাবু ঘরের ভিতর নীরবে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর বিধুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন, বিধু, শান্ত হয়ে বসো। কেমন করে তুমি অদৃশ্য হলে, সে কথা আমাকে বলোনি। আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অদৃশ্য হওয়া খুবই সহজ কথা!

তোমার কাছে সহজ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার!

কলেজ ছাড়বার পর আমি যে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলুম, সে কথা বোধহয় তুমি জানো না। মোহনপুরে আমার বাসা ছিল। সেখানে প্রায় দিন-রাত একটা ঘরে বন্দি হয়ে আমি কেবল পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে হরেকরকম পরীক্ষা করতুম। সেই পরীক্ষার ফলেই অদৃশ্য হবার এই অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছি।

সে উপায়টা কি শুনি?

সে কথা ভালো করে বোঝাতে গেলে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয় নিয়ে এখন ব্যাখ্যা করতে হয়। সে সময় আমার নেই। তবে খুব সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলছি, শোনো। ধরো, কাচের কথা। পাথরের চেয়ে কাচ স্বচ্ছ, তাই পাথরের ভিতর দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু কাচের ভিতর দিয়ে যায়। অস্পষ্ট আলোতে খুব পাতলা কাচ সহজে চোখে পড়ে না– কারণ, সে আলো শোষণ ও প্রতিফলিত করতে পারে খুবই অল্প। সাধারণ সাদা কাচ তুমি যদি জলের ভিতরে ফেলে দাও, তাহলে সে বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আবার জলের চেয়ে ঘন কোনও তরল পদার্থের ভিতরে কাচকে ফেলে দিলে সে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়– কারণ, সেই তরল পদার্থ ভেদ করে খুব অল্প আলোই তার কাছে গিয়ে পৌঁছোতে পারে। ঠিক এই কারণেই বাতাসের ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাস অদৃশ্য হয়ে থাকে। কাচকে যদি ভেঙে গুঁড়ো করা হয় তাহলে বায়ু-চলাচলের স্থানে তাকে রাখলে সকলেই দেখতে পায়! কিন্তু সেই দৃশ্যমান কাচের গুঁড়ো জলের মধ্যে ফেলে দিলে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাদা কাগজ স্বচ্ছ নয়–তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে । কিন্তু ভালো করে তেল মাখিয়ে সাদা কাগজকেও স্বচ্ছ করা যায়।.এইরকম সব ব্যাপারের উপরেই নির্ভর করে আমি এই অপূর্ব আবিষ্কার করেছি।

পূর্ণবাবু বললেন, তারপর কি হল বলো!

বিধু বলতে লাগলঃ

কয়েক বৎসর চেষ্টার পরে যখন আমার মনে হল যে আমি পরীক্ষার সফল হয়েছি, তখন একদিন একটা বিড়ালকে ধরে আনলুম। তারপর সেই বিড়ালের উপরে আমি আমার আবিষ্কৃত ওষুধ প্রয়োগ করলুম। বিড়ালটা ওষুধ খেয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তারপর আমার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে তার দেহ শূন্যে মিলিয়ে গেল। তার দেহ মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মিউ মিউ করে কান্নার জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। শেষটা অনেক কষ্ট করে ও তাড়াহুড়ো দিয়ে বিড়ালটাকে ঘর থেকে বিদায় করলুম। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে পথে গিয়ে আবার সে হইচই বাধিয়ে তুললে।

বিড়াল মিউ মিউ করছে, অথচ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! রাজপথে বেশ ভিড় জমে গেল। যখন বিড়ালটাকে কিছুতেই আবিষ্কার করা গেল না, তখন তাকে ভূতুড়ে বিড়াল মনে করে সবাই সেখান থেকে পলায়ন করলে।

এ ওষুধটা হয়তো এত শীঘ্র আমি নিজের উপরে প্রয়োগ করতুম না, কিন্তু বাধ্য হয়ে শেষটা করতে হল। পূর্ণ, আমি যে ধনীর ছেলে নই এ কথা তুমি জানো। সামান্য যা কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, এই পরীক্ষা শেষ করতেই তা ফুরিয়ে গেল। কয়েক মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালা বিষম তাগাদা শুরু করলে। তাগাদায় যখন ফল হল না, তখন সে নালিশ করে আমার বিরুদ্ধে বডি-ওয়ারেন্ট বার করলে। বাড়িওয়ালা ও ওয়ারেন্টকে ফাঁকি দেবার জন্যে শেষটা আমি মরিয়া হয়ে ওষুধ খেয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়লুম।

বাড়িওয়ালার চোখের সুমুখ দিয়েই আমি সরে পড়লুম, কিন্তু সে আমাকে মোটেই দেখতে পেলে না। রাজপথে জনতার ভিতর দিয়ে লক্ষ্যহীনের মতন এগিয়ে চললুম। কিন্তু খানিক দূর এগুতে না এগুতেই নানান রকম মুশকিল হতে লাগল। মোটরগাড়িগুলো হর্ণ না দিয়েই আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে চলে যেতে চায়। একটা মুটে একরাশ জিনিস ভরা ঝাঁকা মাথায় করে আমার গায়ের উপরে এসে পড়ল। আমি সাৎ করে একপাশে সরে গেলুম বটে, কিন্তু আমার অদৃশ্য গায়ে ধাক্কা খেয়ে মুটেটা আশ্চর্য হয়ে এমনি চমকে উঠল যে তার সমস্ত মোট মাট পথের উপরে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার আঁকার ভিতরে কাচের কি-একটা জিনিস ছিল, তারই এক টুকরো ভেঙে আমার পায়ের তলায় ফুটে গেল ও ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। আমি কাচের টুকরোটা পা থেকে বার করে ফেলবার চেষ্টা করছি, ইতিমধ্যে

সেখানে অনেক লোকজন জমে গেল। তারা মুটেটাকে বললে, তুই কানা হয়ে পথ চলছিস। নাকি? মুটেটা বললে, না বাবু, ভূতে আমায় ধাক্কা মেরেছে! সব লোক হেসে উঠল। মুটে বললে, ওই দেখুন, রক্তমাখা পায়ের দাগ। বেগতিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে। পালাতে লাগলুম। কিন্তু কি আপদ, যতই অগ্রসর হই রক্তমাখা পায়ের রেখা আমার পিছনে পিছনেই চলে। রাস্তার ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠল, সকলেই ভীত, বিস্মিত,

স্তম্ভিত! সেই মস্ত ভিড় রক্তাক্ত পায়ের দাগ ধরে আমায় অনুসরণ করতে লাগল! তার উপরে পথের লেড়ে কুকুরগুলোর ব্যাপার আরও সঙিন করে তুলল। তারা আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের তীব্র ঘ্রাণশক্তি আমাকে আবিষ্কার করে ফেললে অনায়াসেই! হতভাগারা আমাকে ঘেউ ঘেউ করে কামড়ে দিতে এল! ব্যতিব্যস্ত হয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় দেখি একখানা ফিটনগাড়ি সেইখান দিয়ে যাচ্ছে। একলাফে তার উপরে উঠে পড়লুম, গাড়িখানা দুলে উঠল, গাড়োয়ান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে একবার দেখলে; কিন্তু কিছুই না দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

খানিক পরেই এক নতুন বিপদ! একটা ভীষণ মোটা মেম হঠাৎ সেই গাড়িখানার উপরে চড়ে বসল। আমি তাড়াতাড়ি অন্য দরজা দিয়ে আবার পথের উপরে লাফিয়ে পড়লুম। এবারে খুব সাবধানে সকলকে এড়িয়ে পথ চলতে লাগলুম। সন্ধে পর্যন্ত এইরকম ঘুরে ঘুরে রীতিমতো ক্ষুধার উদ্রেক হল। একখানা খাবারের দোকানের একপাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। দোকানি যেই একটু অন্যমনস্ক হয়, অমনি খান-দুই-তিন লুচি বা দু-একখানা কচুরি বা দু-একটা আলুর দম প্রভৃতি টপাটপ সরিয়ে ফেলি! কিন্তু দু-একটা খাবার মুখে ফেলেই নতুন এক বিপদের সম্ভাবনায় মুষড়ে পড়লুম! আমার দেহের রক্ত যেমন বাইরের আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে এলে আর অদৃশ্য থাকে না, তেমনি বাইরের কোনও খাবার জিনিসও হজম না হওয়া পর্যন্ত উদরের মধ্যে দৃশ্যমান হয়েই থাকে। এই সত্যটা ধরতে পেরেই পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে পালিয়ে এলুম।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ও অনাহারে শরীর এলিয়ে পড়ল। এখন উপায়? বাসায় ফেরবার পথ নেই, রাস্তায় রাস্তায় কতক্ষণ আর এমন করে ঘুরে বেড়াব? সারাদেহে এক-টুকরো কাপড় নেই, তার উপরে পৌষমাসের প্রখর শীত! কাঁপতে কাঁপতে ভাবতে লাগলুম, কোনওরকমে যদি জামাকাপড় ও জুতো জোগাড় করতে পারি, আর চশমা ব্যান্ডেজ ও পরচুল প্রভৃতির সাহায্যে। মুখের অদৃশ্য অংশগুলো ঢাকা দিতে পারি, তাহলে আমার চেহারা খুব চমৎকার দেখতে না হলেও এক রকম চলনসই হতে পারে। কেউ শুধোলে বললেই হবে যে, দৈব-দুর্ঘটনায় চোট। খেয়েছি বলে মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধতে

হয়েছে!..আরও মিনিট পনেরো পথ চলবার পরই যা। খুঁজছিলুম সেই সুযোগই পেলুম!–একটা বাড়ির সামনে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে–এককড়ি বিশ্বাস এন্ড কোং। এইখানে যাত্রা ও থিয়েটারের সকল রকম সাজপোশাক ও সরঞ্জাম সুলভে ভাড়া দেওয়া হয়।

কোনওরকম ইতস্তত না করে একেবারে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলুম। ঘরের ভিতরে একটা টাকমাথা বুড়ো একটা বাক্সের সামনে মাদুরের উপর বসে একখানা খাতায় কি লিখছিল! আমার পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে দেখলে, কিন্তু সামনে কিছুই দেখতে না পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চারিদিকে সিন্দুক, বাক্স ও তোরঙ্গ সাজানো রয়েছে, দেয়ালে হরেকরকম সাজপোশাক এবং পরচুল ও গোঁফ-দাড়ি ঝোলানো রয়েছে, নানা আকারের মুখোশ ও অস্ত্রশস্ত্র টাঙানো রয়েছে। আমি পা টিপে টিপে একটা কোণের দিকে যাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু এমনি আমার কপাল যে হঠাৎ আমার ধাক্কা লেগে একটা তোরঙ্গ গেল হুড়মুড় করে পড়ে! বুড়ো এবারে কাজকর্ম ফেলে একেবারে উঠে দাঁড়াল! যে-তোরঙ্গটা পড়ে গিয়েছিল তার কাছে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে না পেরে আরও বেশি হতভম্ব হয়ে গেল।

এ সুযোগ আমি ছাড়লুম না। হঠাৎ বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জোরে তার গলা টিপে ধরলুম! দু-চারবার গোঁ-গোঁ করেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর

পূর্ণবাবু বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন, বল কি হে, তুমি অনায়াসেই বুড়োটার গলা টিপে ধরলে?

বিধু বললে, তখন তা ছাড়া আর কি উপায় ছিল বলো? যে অবস্থায় আমি পড়েছিলুম, আমাকে বাঁচতে হবে তো?

পূর্ণবাবু বিরক্ত ভাবে বললেন, তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অনায়াসেই তুমি অন্য কারুকে খুন করতে পারো? কি অন্যায়?

বিধু উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, তা পারি। আত্মরক্ষা হচ্ছে জীবনের ধর্ম। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নরহত্যা করা আমি অপরাধ বলে মনে করি না। এর ভেতরে তুমি অন্যায়টা দেখলে কোথায়?

পূর্ণবাবু খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বিধু, তোমার স্বভাব ঢের বদলে গেছে দেখছি। কিন্তু সে-কথা থাক। তুমি যা বলছিলে বলো।

বিধু আবার আরম্ভ করলে–

খানিকটা দড়ি নিয়ে বুড়োর হাত-পা আমি বেঁধে ফেললুম। তার মুখে কতকগুলো ন্যাকড়া গুঁজে দিলুম, যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে না ওঠে! তারপর নিজের মনের মতন পোশাক বেছে নিয়ে পরে ফেললুম। পরচুল, দাড়ি-গোঁফ, একখানা ঠুলি চশমা নিয়ে মুখের অদৃশ্য অংশ ঢাকা দিলুম! একটা মুখোশের নাক কেটে নিয়ে নিজের মুখের যথাস্থানে বসিয়ে দিলুম। তারপর মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করে একখানা আরসির সামনে পরীক্ষা করে দেখলুম, আমার মুখখানা দেখতে অদ্ভুত হলেও অমানুষিক হয়নি! বুড়োর বাক্স হাতড়ে দুশো পঁচিশ টাকা পেলুম। নোট ও টাকাগুলো পকেটে পুরে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

পূর্ণবাবু আবার বললেন, পরের টাকা নিতে তোমার সংকোচ হল না?

বিধু বললে, কিছুমাত্র না! টাকা যার কাছে থাকে তারই হয়! লোকে তা বুঝলে এতদিনে পৃথিবীতে আর গরিব থাকত না! সেখান থেকে এক হোটেলে ঢুকে আগে পেটের ক্ষুধাকে শান্ত করলুম। তারপর কেমন করে আবার নিজের বাসায় ফিরে গিয়ে আমার পুঁথিপত্র ও ওষুধের শিশি-বোতলগুলো শ্রীপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে নিজেও এখানে এসে হাজির হলুম, সে-সব কথা আর না বললেও চলবে।

শোনো পূর্ণ! আমি হচ্ছি অদৃশ্য মানুষ! কিন্তু নিরাকার হবার আগে অদৃশ্য হওয়ার যে সব আনন্দ মনে-মনে কল্পনা করেছিলুম, আজ সে-সব আকাশ কুসুমের মতো মিলিয়ে গিয়েছে! এখন আমার মতো অসহায় আর কেউ নেই! আমাকে সবাই ভয় করে, ভীষণ শত্রু বলে মনে করে! কোনও সাধারণ মানুষের সাহায্য না পেলে পৃথিবীতে আমার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। সেই জন্যেই বংশীবদনকে আমার সঙ্গী করেছিলুম, কিন্তু সে হতভাগাও আমার পুঁথিপত্র ও টাকা চুরি করে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে!

পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখন কী করতে চাও?

বিধু বললে, মনে করছি এখন তোমার এখানেই কিছুদিন থাকব। ভগবান তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছেন। মনে করলেই আমরা দুজনেই দুজনের অনেক উপকার করতে পারি। তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে, আমাকে লুকিয়ে রাখবে, আর আমি দুনিয়ার ঐশ্বর্য লুটে নিয়ে এসে তোমার কাছে সঁপে দেব! তুমি আমাকে সাহায্য করবে পূর্ণ?

পূর্ণবাবু চুপ করে বসে রইলেন।

চুপ করে রইলে যে? পূর্ণ, তুমি কি আমার কথায় রাজি নও?

পূর্ণবাবু নীরবে যেন কি শুনতে লাগলেন।

পুর্ণ, নীচে যেন দরজা খোলার শব্দ হল না?

কই, আমি তো শুনতে পাইনি!

বিধু খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলে? তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, উঁহু, সিঁড়ির উপরে নিশ্চয়ই কাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে, কারা ওপরে আসছে?

পূর্ণবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কে আবার আসবে?

কিন্তু বিধুর সন্দেহ দূর হল না! সে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু পূর্ণবাবুও তাড়াতাড়ি এগিয়ে তার আগেই দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

বিধু গর্জন করে বললেন, বিশ্বাসঘাতক!–এবং তার পরেই সে পূর্ণবাবুর উপরে লাফিয়ে পড়ল ও দুই হাতে সবলে তার গলা টিপে ধরে তাকে একটানে মেঝের উপরে আছড়ে ফেললে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে পূর্ণবাবু তখনি উঠে বসলেন এবং সেই অবস্থায় দেখলেন, তার চোখের সামনে জামাকাপড়গুলো টান মেরে খুলে ফেলে বিধু আবার নিরাকার হয়ে গেল!

থানার দারোগা পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে সিঁড়ি বয়ে তাড়াতাড়ি উপরে আসছিলেন এমন সময় আচমকা তার দেহের উপরে হুড়মুড় করে একটা অদৃশ্য ভার এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হলেন একেবারে কুপোকাত!

দারোগা-মশাই যখন আবার দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারলেন, তখন দেখলেন পূর্ণবাবু রক্তাক্ত মুখে বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

তিনি দারোগাবাবুর সামনে এসে বললেন, অদৃশ্য মানুষ আবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে!

.

দ্বাদশ । অদৃশ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

পূর্ণবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, আপনারা বুঝি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চোর ধরতে যান?

দারোগাবাবু থতমতো খেয়ে বললেন, কেন বলুন দিকি?

পূর্ণবাবু আরও রেগে বললেন, কেন, এখনও তা বুঝতে পারছেন না? আপনারা এমন গোলমাল করে বাড়ির ভেতর ঢুকেছেন যে, সে আগে থাকতেই সাবধান হয়ে পালিয়ে গেল!

দারোগাবাবু অপ্রতিভভাবে বললেন, তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে!

হ্যাঁ, এ-ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই! অদৃশ্য মানুষকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সে বদ্ধ পাগল! সে মানুষের টাকা কেড়ে নেবে, নরহত্যা করবে, পৃথিবী তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠবে! আমি তার সমস্ত মনের কথা শুনেছি, সে সমস্ত মানুষকে ঘৃণা করে, আজকের ব্যাপারের পর সে আর কারুকেই ক্ষমা করবে না! ছি, ছি, কি সর্বনাশটাই করলেন বলুন দেখি!

দারোগাবাবু ম্রিয়মান মুখে বললেন, তাকে কি ধরবার আর কোনওই উপায় নেই?

পূর্ণবাবু বললেন, উপায় থাক আর না থাক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে তো!...দাঁড়ান, হয়েছে! শুনুন, শ্রীপুরের চারিদিকে চৌকিদার রাখুন-তারা সব পথ-ঘাট আগলে থাক। পথে ঘাটে কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ করলেই খোঁজ নিন! তার মুখেই আমি শুনেছি, সে অদৃশ্য হলেও কুকুররা তার অস্তিত্ব টের পায়! শ্রীপুরের সমস্ত লোককে সশস্ত্র আর সাবধান হয়ে থাকতে বলুন! কেউ যেন তার বাড়ির ভিতরে ঢোকবার পথ খোলা না রাখে! সর্বদাই খাবার-দাবার যেন লুকিয়ে রাখা হয়,-যেন সে খাবার চুরি করতে না পারে, যেন সে অনাহারে থাকে!

দারোগাবাবু বললেন, তাহলে আপনিও আসুন, এ-বিষয়ে চটপট একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাক!

পূর্ণবাবু বললেন, যাচ্ছি। কিন্তু আর একটা কথা জেনে রাখুন। তার অদৃশ্য দেহের ভিতরে হজম না হওয়া পর্যন্ত খাবার দেখা যায়। খাবার হজম করবার জন্যে তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। এখানকার প্রত্যেক বনেজঙ্গলে আর ঝোপে-ঝাপে পাহারা দেবার জন্যে লোক

রাখতে হবে। যদি দরকার হয়, পথে-ঘাটে কাচের টুকরোও ছড়িয়ে রাখতে হবে। তার পা আহত হলে রক্ত পড়ে, আর সে রক্ত অদৃশ্য নয়! জানি, এ-ব্যবস্থা নিষ্ঠুর। কিন্তু উপায় কি? সে একে অদৃশ্য, তার ওপরে পাগল আর হিংস্র জন্তুর মতো ভয়ংকর!

দারোগা বললেন, এত তো আটঘাট বেঁধে কাজ করতে বলছেন, কিন্তু তার আগেই সে যদি এ-মুল্লুক ছেড়ে লম্বা দেয়?

পূর্ণবাবু বললেন, সে এখনি এখান থেকে নড়বে বলে মনে হয় না। বংশী বলে কে একটা লোক তার দরকারি পুঁথিপত্র নিয়ে পালিয়েছে। আমার বোধহয় সেগুলো সে আগে ফিরে পাবার চেষ্টা করবে।

দারোগা বললেন, তাহলে আর দেরি নয়। আসুন, বেরিয়ে পড়া যাক।

দুজনে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলেন।

.

ত্রয়োদশ। দৃশ্যে ও অদৃশ্যে

অদৃশ্য মানুষ নিশ্চয় দুর্জয় ক্রোধে অন্ধের মতো হয়ে পূর্ণবাবুর বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। কারণ সেই বাড়ির দরজার সামনে তখন একটি ছোট শিশু নিজের মনে খেলা করছিল, আচম্বিতে কোনও অদৃশ্য শক্তি তাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেয় এবং বেচারির একখানা পা ভেঙে যায়।

তারপর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আর তার কোনওই সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো পূর্ণবাবুর বিশ্বাসঘাতকতায় ও নিজের আশায় নিরাশ হয়ে খানিকক্ষণের জন্যে সে অত্যন্ত দমে গিয়েছিল এবং কোনও নির্জন স্থানে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিল।...

কিন্তু সে জানতে পারলে না, ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী কীরকম জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শ্রীপুরের ঘরে-ঘরে প্রত্যেক সদর-দরজা আজ বন্ধ। কোনও স্কুল, কলেজ ও আপিসও আজ খোলা নেই। খাবারওয়ালারা পর্যন্ত তাদের দোকানে ঝপ তুলে দিয়েছে। এবং পথে পথে সেপাইরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

শ্রীপুর শহরের প্রান্তে নদীর ঘাটে খেয়া পারাপার আজ বন্ধ। এবং শ্রীপুর স্টেশনে সমস্ত রেলগাড়িরই কামরার দরজা আর জানলা আজ বন্ধ! শ্রীপুর থেকে মালগাড়ি যাওয়াও আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কি জানি, ভোলা মালগাড়ি পেয়ে অদৃশ্য মানুষ পাছে তার উপরে চড়ে সকলের অজান্তে পলায়ন করে!

মাঠে মাঠে বনে-জঙ্গলে আনাচ-কানাচে মোটা মোটা লাঠি-সোটা, রামদা, তরোয়াল ও সড়কি নিয়ে দলে দলে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হাওয়ায় কোথাও একটা পাতা নড়লেই হাঁ হাঁ করে সেই দিকে ছুটে যাচ্ছে।

অদৃশ্য মানুষ যে শ্রীপুরের মায়া এখনও ত্যাগ করেনি, শীঘ্রই সে প্রমাণ পাওয়া গেল।

শ্রীপুরের এক পাটকলের ম্যানেজার ছিলেন চন্দ্রভূষণবাবু। সন্ধ্যার কিছু আগে নদীর ধারের মাঠের ভিতরে হঠাৎ তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। চন্দ্রবাবুর সর্বাঙ্গে ভয়ানক প্রহারের দাগ এবং তার মাথাটাও কে ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে। চন্দ্রবাবুর মৃতদেহের পাশে তার নিজের মোটা বেতের লাঠিটা দু-টুকরো হয়ে পড়েছিল এবং তারই খানিক তফাতে ছিল একটা মোটা লোহার রক্তমাখা গরাদ! বেশ বোঝা গেল, ওই গরাদের সাহায্যেই চন্দ্রবাবুকে কেউ হত্যা করে গিয়েছে।

এই ব্যাপারে শহরময় অত্যন্ত হইচই পড়ে গেল। চন্দ্রবাবু ছিলেন নির্বিরোধী ভালোমানুষ লোক–শ্রীপুরে কেউ তার শত্রু ছিল না। সুতরাং সকলেরই ধারণা হল, অদৃশ্য মানুষ ছাড়া এ-কাজ আর কেউ করেনি। কিন্তু চন্দ্রবাবুকে খামোকা সে খুন করতে যাবে কেন? এ খুন। যে টাকার জন্যে নয় তার প্রমাণ, চন্দ্রবাবুর পকেট থেকে মানিব্যাগটা হারায়নি! তবে?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সঠিক ব্যাপারটা জানা না গেলেও, একটা হদিস পাওয়া গেল। মাঠের ধারের একখানা বাড়ি থেকে একটি ছোট মেয়ে যা দেখেছিল, তাই নিয়ে সকলে। অনেকরকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। মেয়েটি বলে, মাঠের উপর দিয়ে একটা লোহার গরাদ ঠিক পাখির মতোই নাকি উড়ে যাচ্ছিল, আর তার পিছনে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটছিলেন চন্দ্রবাবু। মেয়েটি তার পরের কথা আর কিছু বলতে পারলে না।

সবাই যা আন্দাজ করলে তা হচ্ছে এই অদৃশ্য মানুষ বোধ হয় সশস্ত্র হবার জন্যে কোনও বাড়ির জানলা থেকে এই লোহার গরাদটা খুলে নিয়েছিল। সে যখন মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে দেখা না গেলেও তার হাতের লোহার গরাদটা অদৃশ্য হয়নি। আর সেই উড়ন্ত গরাদ দেখে চন্দ্রবাবু বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে তাকে নিজের হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করবার চেষ্টা করেছিলেন। অদৃশ্য মানুষ তাঁর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেও যখন মুক্তি পায়নি, তখন তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

চন্দ্রবাবুকে হত্যা করে অদৃশ্য মানুষ যে-কোন দিকে গেল তাও ঠিক বোঝা গেল না। তবে ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে যে মস্ত একটা চক্রান্তের সৃষ্টি হয়েছে, এটা বোধহয় সে বুঝে নিয়েছিল! কারণ, চারিদিকে এমন সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও কেউ তাকে আর আবিষ্কার করতে পারলে না।

তবে সন্ধ্যার পরে একদল কুলি যখন মাঠ পার হয়ে শ্রীপুরের দিকে আসছিল, তখন তারা নাকি শুনতে পেয়েছিল যে, মাঠের ভিতরে কোনও অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে কখনও কান্নার, কখনও হাসির ও কখনও গর্জনের রোমাঞ্চকর শব্দ হচ্ছে! ভূত মনে করে কুলিরা প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে এসেছিল!

.

চতুর্দশ । পূর্ণবাবুর বাড়ি আক্রমণ

সকালবেলায় পূর্ণবাবু একখানা অদ্ভুত পত্র পেলেন। চিঠিখানা বেয়ারিং। পত্রলেখক লিখছেঃ

পূর্ণ, তুমি খুবই চালাক আর সাধু লোক নয়? আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলুম। আর তুমি বন্ধু হয়েও আমাকে ধরিয়ে দিলে। আমার সঙ্গে এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার কি স্বার্থসিদ্ধি হবে, তা তুমিই জানো। তোমারই চক্রান্তে একটা দিন আমাকে হাটে-মাঠে-বাটে ঘেয়ো কুকুরের মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। যাতে আমি খেতে ও ঘুমোতে না পাই সেজন্যে তুমি কোনও সুব্যবস্থা করতেই বাকি রাখোনি। তবু আমি পেট ভরে খেয়েছি ও সারারাত প্রাণ ভরে ঘুমিয়েছি। এ খবর শুনে তুমি বোধহয় খুব খুশি হবে?

এইবারে আসল নাটক শুরু হবে–হাসির নাটক নয়, বিয়োগান্ত নাটক, অর্থাৎ তার মধ্যে পতন ও মৃত্যুর কোনওই অভাব হবে না।

এ চিঠি যখন তুমি হাতে পাবে, তখন থেকেই বিভীষিকা শুরু হবে। আজ থেকে শ্রীপুরের রাজা আর কেউ নয়–এখানে এখন কেবল আমারই একচ্ছত্র অধিকার! শ্রীপুরের সর্বশক্তিমান মহারাজা হচ্ছি আমি–অদৃশ্য মানব! কাকে রাখব আর কাকে মারব সে-কথা কেবল আমিই জানি।

তবে, প্রথম দিনে আমি কী করব, সে কথাটা তোমার কানে কানে চুপিচুপি আমি জানিয়ে রাখছি। আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে কী হবে, তার একটা দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে প্রথম দিনেই একজনের জন্যে আমি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করব। আসামির নাম হচ্ছে, বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুর দূত এখনি তার দিকে অগ্রসর হয়েছে। সে ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ করে বসে থাকতে পারে, বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, নিজের চারিদিকে অগুন্তি সেপাই রাখতে পারে–সে যা খুশি করতে পারে, কিন্তু তবু মৃত্যু, অদৃশ্য মৃত্যু তাকে। গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে আসছে। তাকে আমি খুব সাবধান হতে বলি, কারণ লোকে তাহলেই বুঝতে পারবে যে, সাবধান হলেও আমার হাত থেকে রক্ষা নেই।

যে তাকে সাহায্য করবে তাকেই মরতে হবে। তুমি শুনে রাখো বন্ধু, আজকে পূর্ণের মৃত্যু-দিবস!

পূর্ণবাবু চিঠিখানা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বললেন, বিধু ঠাট্টা করে এ চিঠিখানা লেখেনি। সে তার মনের কথাই খুলে লিখেছে। তিনি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সামনে যে গরম চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেদিকেও তার কোনও খেয়াল রইল না। আগে চাকরকে ডেকে তিনি বাড়ির ভিতরে ঢোকবার সব পথ বন্ধ করে দিতে বললেন। তারপর দেরাজের ভিতর থেকে একটা রিভলভার বার করে নিজের পকেটে পুরলেন। তারপর ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই বললেন, বিধু! তাহলে কাল আহার আর নিদ্রা থেকে তুমি বঞ্চিত হও নি? বেশ, বেশ! তাই মনের আনন্দে তুমি আমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছ? এও মন্দ কথা নয়। কিন্তু বিধু, তুমি যতই অদৃশ্য হও, টেক্কা মারব কিন্তু আমিই! বলতে বলতে তিনি টেলিফোনের কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং থানার দারোগাকে সকল কথা জানালেন। দারোগা বললেন, আমি এখনি আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। টেলিফোনের কাছ থেকে তিনি একটা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ রাজপথের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই আবার বললেন, কে জানে বিধু এতক্ষণে আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কি না! হয়তো সে এখন পথে দাঁড়িয়ে আমার পানেই তাকিয়ে আছে!–একটা কি জিনিস ঝপ করে জানলার সার্সির উপরে এসে পড়ল।–পূর্ণবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি পিছু হটে এলেন এবং তারপরে উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললেন, চড়ুই পাখি! আমার মনে নিশ্চয় ভয় ঢুকেছে। নইলে সামান্য একটা চড়ুই পাখি আমাকে এমন চমকে দিতে পারে?

সদর-দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হল। তিনি নিজে নেমে গেলেন। দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–কে?

দরজার ওপাশ থেকে দারোগাবাবু সাড়া দিলেন।

পূর্ণবাবু খিল খুলে দরজাটা একটুখানি ফঁক করে আগে উঁকি মেরে দেখে নিলেন, সত্যিই দারোগাবাবু কি না! তারপর নিঃসন্দেহ হয়ে দরজার এক পাটি খুব কম করে খুলে দারোগাবাবুকে ভিতরে এনে আবার খিল তুলে দিলেন।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে ওঠবার আগেই শুনলেন, একটা ঘরের ভিতর থেকে ঝনঝন করে সার্সি-ভাঙার আওয়াজ এল!

দুজনে সে ঘরে গিয়ে ঢুকতে-না-ঢুকতেই আরও দুখানা সার্সির কাচ ভেঙে পড়ল!

পূর্ণবাবু বিবর্ণ মুখে বললেন, বিধু তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। আমার বাড়ি অবরোধ শুরু হল!

দারোগা বললেন, বাড়ির বাইরে থেকে কোনও কিছু ধরে কেউ উপরে উঠতে পারবে না তো?

টিকটিকি আর পাখি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

দুমদাম, ঝনঝনাঝন, ঠকঠকাঠক! বড় বড় ঢিল বৃষ্টি হচ্ছে, কতকগুলো সার্সি ভাঙল, গুণে বলা দায়! অদৃশ্য মানুষকে দেখা যাচ্ছে না, বাড়ির ভিতরে ঢুকতে না পেরে সে ঢিল ছুঁড়েই মনের আক্রোশ মিটিয়ে নিচ্ছে!

পূর্ণবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, এখন কি করা যায় বলুন দেখি?

দারোগা বললেন, একটা উপায় আমার মনে হচ্ছে। আপনি কাল বললেন না যে, কুকুররা অদৃশ্য মানুষের গন্ধ পায়?

হ্যাঁ।

আমার তিনটে ডালকুত্তা আছে। বলেন তো নিয়ে আসি। তারা চোখে দেখতে না পেলেও ঠিক ওই দুরাত্মাকে ধরে ফেলবে!

কিন্তু বাইরে যাবেন কেমন করে? বিধু যে পথ আগলে আছে!

আপনার রিভলভারটা যদি দেন, তাহলে ঠিক আমি যেতে পারব। রিভলভারটা দেখলে ও বদমাইশ নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে না।

পূর্ণবাবু অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিভলভারটা দারোগার হাতে সমর্পণ করলেন। তারপর নীচে নেমে আচমকা সদর-দরজাটা খুলে দারোগাকে বার করে দিয়েই তখনি আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দারোগা পূর্ণবাবু বাড়ির ডানদিকের মাঠ দিয়ে সাবধানে চারিদিকে চোখ রেখে অগ্রসর হলেন।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর বললে, তুমি দাঁড়াও!

দারোগা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রিভলভারটা মুঠোর ভিতরে চেপে ধরলেন।

কণ্ঠস্বর বললে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বুকের ধুকপুকুনি সামলে নিয়ে দারোগা মুখসাবাসি দেখিয়ে বললেন, সে খবরে তোমার দরকার কী?

পরমুহূর্তেই দারোগার নাকের উপরে যেন একটা পাঁচ সের ওজনের ঘুষি এসে পড়ল। ধপাস করে মাটির উপরে বসে পড়ে যখন তিনি চোখের সামনে রাশি রাশি সর্ষেফুল ফোঁটা দেখতে লাগলেন, তখন হঠাৎ কার অদৃশ্য হস্ত এসে তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিলে!

কণ্ঠস্বর বললে, যাও, বাড়ির ভেতরে ফিরে যাও! নইলে–

দারোগা হতাশ ভাবে মুখ তুলে দেখলেন, যেন কোনও জাদুবিদ্যার বলেই শূন্যে একটা রিভলভার স্থির হয়ে আছে–তার নলচেটা তাঁরই দিকে ফেরানো!

কণ্ঠস্বর বললে, উঠে দাঁড়াও! আমার সঙ্গে কোনওরকম চালাকি খেলতে এসো না! মনে রেখো, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। সুড়সুড় করে ভালোমানুষটির মতন বাড়ির ভেতরে ফিরে যাও!

দারোগা বললেন, পূর্ণবাবু আর আমাকে দরজা খুলে দেবেন না।

কণ্ঠস্বর বললে, কিন্তু তোমাকে ফিরে যেতেই হবে! নইলে তুমি লোকজন ডেকে নিয়ে আসবে! তোমার সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া নেই, কিন্তু আমার কথা না শুনলে তোমাকে আমি বধ করতে বাধ্য হব।

দারোগা আচমকা এক লাফ মেরে রিভলভারটা অদৃশ্য হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন–সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের মুখ থেকে দপ করে বিদ্যুৎশিখা জ্বলে উঠল এবং পর মুহূর্তে দারোগার দেহ ঘুরে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

দোতালার একটা জানলার পাল্লা ফাঁক করে পূর্ণবাবু সমস্ত দৃশ্যই দেখছিলেন। এবং ইতিমধ্যেই টেলিফোনে সাহায্যের জন্যে তিনি থানায় খবর দিয়েছিলেন। দারোগার পতনের পর রিভলভারটা সেখানেই শূন্যে দুলতে লাগল, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দেখলেন, থানা থেকে চারজন পাহারাওয়ালা এসে হাজির হয়েছে। তিনি চট করে তাদের ভিতরে এনে আবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, তোমাদের দারোগা আর বেঁচে নেই। অদৃশ্য মানুষের হাতে রিভলভার আছে। খুব সাবধান!

বাড়ির পিছন দিকের একটা দরজার উপরে দুমদুম করে পদাঘাতের শব্দ হতে লাগল। খিড়কির সে দরজাটা তেমন মজবুত ছিল না–অদৃশ্য মানুষ বোধ হয় সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পূর্ণবাবু সেই দিকে ছুটলেন কিন্তু তার আগেই খিড়কির দরজার পলকা খিলটা সশব্দে ভেঙে গেল!

পূর্ণবাবু চিৎকার করে বললেন, অদৃশ্য মানুষ বাড়ির ভেতরে ঢুকল! মনে রেখো, তার হাতে রিভলভার আছে!

পাহারাওয়ালারা দুহাতে লাঠি ধরে এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে রইল। উপর উপরি দু-বার রিভলভারের গর্জন শোনা গেল! কিন্তু তার আগেই পূর্ণবাবু তড়াক করে মস্ত লাফ মেরে একটা ঘরে ঢুকে পড়ে সে-যাত্রা প্রাণ রক্ষা করলেন।

অদৃশ্য মানুষকে দেখা গেল না বটে কিন্তু এটা দেখা গেল যে একটা চকচকে রিভলভার শূন্যপথে থেকে থেকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে!

হঠাৎ একটা পাহারাওয়ালা গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে রিভলভারের পিছনদিকে প্রচণ্ড এক লগুড়াঘাত করলে। একটা যন্ত্রণাময় চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা ছিটকে তফাতে গিয়ে পড়ল! অদৃশ্য মানুষের হাতে আর রিভলভার নেই দেখে পূর্ণবাবু ও অন্য তিনজন পাহারাওয়ালাও আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

যতক্ষণ অদৃশ্য মানুষের হাতে রিভলভারটা ছিল ততক্ষণ তবু তার একটা ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এখন সে যে কোথায় আছে সে-রহস্য কিছুই বোঝা গেল না।

কিন্তু যে পাহারাওয়ালা তার হাতে লাঠি মেরেছিল, তাকে সে ক্ষমা করলে না। উঠানে এক কোণে একটা টুল ছিল, হঠাৎ সেখানা শূন্যে উঠে ঘুরতে ঘুরতে প্রথম পাহারাওয়ালার মাথার উপরে এসে পড়ল! বিকট চিৎকার করে সে প্রপাত ধরণীতলে হল!

তার পরেই পূর্ণবাবু সভয়ে দেখলেন, রিভলভারটা মাটির উপর থেকে আবার শূন্যে লাফিয়ে উঠল। চোখের নিমেষে বাকি পাহারাওয়ালারা আবার অদৃশ্য হল এবং পূর্ণবাবু

এবারে খিড়কির দরজা দিয়ে একেবারে বাড়ির বাইরের দিকে দৌড় দিলেন! দুম করে রিভলভারের একটা শব্দ হল–কিন্তু সে গুলিও তাকে স্পর্শ করতে পারলে না!

.

পঞ্চদশ । অদৃশ্য মানুষ দৃশ্যমান হল

পূর্ণবাবু মাঠের উপর দিয়ে ছুটছেন ঝড়ের মতন বেগে! রিভলভারের লক্ষ্যকে ব্যর্থ করবার জন্যে তিনি সাপের মতন এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগলেন। খানিক দূর গিয়ে মুখ ফিরিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, সেই নাছোড়বান্দা রিভলভারটা তখনও বেগে তার অনুসরণ করছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! ছুটন্ত মানুষ ও তার পিছনে শূন্যপথে উড়ন্ত রিভলভার! বাজারের একখানা ছবিতে দেখা যায়, ভীত পরশুরামের পিছনে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র শূন্য-পথে তেড়ে আসছে। এ-দৃশ্যও অনেকটা সেইরকম!

রিভলভার আরও দুবার অগ্নিময় ধমক দিলে, কিন্তু তাও ব্যর্থ হল! অদৃশ্য মানুষ নিশ্চয়ই রিভলভার ছোঁড়ায় অভ্যস্ত ছিল না, তাই এবারের মতো পূর্ণবাবু কোনও গতিকে প্রাণে বেঁচে গেলেন! কিন্তু তবু সে পূর্ণবাবুর পিছু ছাড়লে, খালি-রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে ধরবার জন্যে আরও জোরে অদৃশ্য পা দুটো চালিয়ে দিলে।

.

আমাদের ডাক্তার মানিকবাবু সেদিন পথের ধারে একটা পুকুর-ঘাটে বসে নিজের মনে মাছ ধরছিলেন। মানিকবাবুর জীবনে এই একটি মাত্র শখ আছে। আর তার এশখ এমন দুর্দান্ত যে, তিনি শীত গ্রীষ্ম মানতেন না, যে-কোনও পুকুর-ঘাটে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসে পড়তেন। কিন্তু এমন একজন অকৃত্রিম মাছ-শিকারির উপরে মাছের দল মোটেই সদয় ছিল না–ঘাটের উপরে তাকে দেখলেই তারা যেন তার ছিপকে বয়কট করত। কিন্তু

সেজন্যে মানিকবাবুর উৎসাহ কিছুমাত্র কমে না! কেউ ঠাট্টা করলে উলটে বলেন, ওহে, মাছ ধরতে গেলেই যে মাছ ধরতে হবে, এর কিছু মনে আছে? তোমরা তো রোজ কতরকম মন্ত্র পড়ে ভগবানকে ডাকো, কিন্তু ভগবান তোমাদের দেখা দেন কি? এমন অকাট্য যুক্তির উপরে কারুর আর কোনও কথা বলবার থাকত না।

মানিকবাবু একমনে মাছ ধরছেন–অর্থাৎ ধরবার চেষ্টা করছেন, এমন সময়ে দ্রুত পদশব্দ শুনে মানিকবাবু মুখ তুলে দেখলেন, ভয়-ব্যাকুল পূর্ণবাবু পথের উপর দিয়ে তিরবেগে ছুটে চলেছেন এবং ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলছেন, অদৃশ্য মানুষ! অদৃশ্য মানুষ!

পুকুর-ঘাটে বসে মানিকবাবুর আর বেশি কিছু শোনবার দরকার হল না। তখন জলের মাছ ডাঙায় না তুলে, অদ্ভুত একটা ডিগবাজি খেয়ে ডাঙার মানুষ মানিকবাবু ঝপ করে একেবারে জলের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মাছেরা সেদিন কি ভাবলে জানি না। হয়তো তারা ভাবলে, ডাঙায় বসে রোজ বিফল হয়ে মানিকবাবু রাগ করে আজ তাদের ধরবার জন্যেই জলের ভিতরে ঝাঁপ দিয়েছেন!

মাছেরা কি ভাবলে আর না ভাবলে সেটা ভাববার অবসর মানিকবাবুর মোটেই রইল না। কারণ তিনি সাঁতার জানতেন না। জলের ভিতরে প্রবেশ করেই সে কথাটা তার মনে পড়ল। ভুড়ি ভরে জল খেতে খেতে একখানা নিরেট জগদ্দল পাথরের মতো ক্রমেই তিনি নীচের দিকে নামতে লাগলেন। তারপরেই হঠাৎ তার মনে হল, জলের ভিতরে এত নীচে নামা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাগলের মতন দুবার হাত-পা ছুঁড়তেই তার দেহটা আবার উপর দিকে উঠতে লাগল।

পুকুরের ধারে একটা মস্ত বটগাছ জলের ভিতরে অনেকগুলো ঝুরি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল–জলে ঝুরি ঝুলিয়ে সেও যেন মাছ ধরবার চেষ্টা করছে! ভাগ্যে মানিকবাবুর দেহটা ঠিক সেইখানেই ভস করে ভেসে উঠল, তাই বটের ঝুরি ধরে সে-যাত্রা মানে মানে তিনি তার পৈতৃক প্রাণটি রক্ষা করলেন।

মানিকবাবু নিজের মনে বললেন, বাপ! যে জলটা, আজ খেয়েছি, এ জীবনে বোধ হয় আর জল-তেষ্টা পাবে না! অদৃশ্য মানুষের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে শেষটা আজ আত্মহত্যা করেছিলুম আর কি!...কিন্তু পূর্ণবাবুর কি হল?

মানিকবাবু ভয়েভয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু পূর্ণবাবুর কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না!

কিন্তু ওদিকে ইতিমধ্যেই পাশা উলটে গেছে!

পূর্ণবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহারাওয়ালারা থানায় গিয়ে খবর দিয়েছে এবং সেখান থেকে দলে-দলে সেপাই পূর্ণর্বাবুকে রক্ষা করবার জন্যে ছুটে এসেছে।

এখন পালাবার পালা হচ্ছে অদৃশ্য মানুষের।

কিন্তু পাছে সে আবার ফাঁকি দেয় সেই ভয়ে পূর্ণবাবু সেপাইদের ডেকে চেঁচিয়ে বললেন, শিগগির! হাতধরাধরি করে সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও! অদৃশ্য মানুষ এর মধ্যেই আছে!

সকলে তাড়াতাড়ি পূর্ণবাবুর কথামতো কাজ করলে।

পূর্ণবাবু আবার বললেন, সবাই ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে চক্রটাকে ছোট করে আনন। তাহলে অদৃশ্য মানুষ আর পালাতে পারবে না! তার কথা শেষ হতে না হতেই বিপুল বিক্রমে অদৃশ্য মানুষ আগে তাকেই আক্রমণ করলে! এবারে পূর্ণর্বাবুও তাকে ছাড়লেন না, তার অদৃশ্য দেহটাকে তিনি দুই হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন! তার পর দুজনে জড়াজড়ি করে পথের উপরে গিয়ে পড়লেন।

সেপাইরা সবাই ছুটে এল হাত দিয়ে অনুভব করে সকলে মিলে অদৃশ্য মানুষের মাথা, গলা, বুক, বাহু, কোমর, জানু ও পা সজোরে চেপে ধরলে!

অদৃশ্য মানুষ একবার যন্ত্রণা-বিকৃত বদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল, উঃ! গেলুম!– তারপরে তার সমস্ত দেহ একেবারে স্থির হয়ে গেল।

পূর্ণবাবু বলে উঠলেন, ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়াও! ও আহত হয়েছে–আর পালাতে পারবে না!

সেপাইরা কেউ কেউ বললে, বদমাইশটা দুষ্টুমি করে চুপ করে আছে, ছেড়ে দিলেই পালাবে!

পূর্ণবাবুর ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছিল, তার শরীরেও নানা জায়গায় কাটাকুটির দাগ! সেই অবস্থাতে তিনি উঠে অদৃশ্য মানুষের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আন্দাজে তার বুকের উপরে হাত দিয়ে বললেন, না, বিধু আর পালাতে পারবে না! এর হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে গেছে! এ আর বেঁচে নেই!

তখন শ্রীপুর শহরের সমস্ত লোক সেইখানে এসে জড়ো হয়েছিল। সকলেরই মুখে বিস্ময় ও আতঙ্ক! সকলেই নানারকম কথা বলে চ্যাঁচামেচি করছে!

একটা বুড়ি ভিড়ের ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অদৃশ্য মানুষকে দেখবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সে ভীত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, আমি ওকে দেখতে পেয়েছি, আমি ওকে দেখতে পেয়েছি!

বুড়ির কথা শুনে পূর্ণবাবুও সচকিত দৃষ্টিতে দেখলেন, পথের ধুলোর উপরে কাচের মতন স্বচ্ছ একখানা মানুষের হাত ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে তার স্বচ্ছতা দূর হয়ে গেল, তখন তাকে দেখাতে লাগল ঠিক যেন ঘষা কাচের একখানা হাতের মতো।

একটা সেপাই বলে উঠল, আরে, আরে ওর পা-দুটোও যে দেখা যাচ্ছে!

দেখতে-দেখতে সকলের স্তম্ভিত চক্ষের সামনে অদৃশ্য মানুষের সমস্ত দেহটাই মায়াময় ছায়ার মতন ফুটে উঠল! তারপর ধীরে ধীরে সেই ছায়াটা ক্রমেই ঘন ও নিরেট হয়ে

উঠল। তারপর অদৃশ্য মানুষ যখন স্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান হল, তখন সে রক্তমাংসের সম্পূর্ণ গঠন ফিরে পেয়েছে।

যে ওষধির প্রক্রিয়ায় তার জীবন্ত দেহ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, মরণ সেই ওষধির গুণ নষ্ট করে তার রক্ত-মাংসে গড়া দেহকে পৃথিবীর ধূলায় আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল!

পথের উপরে শুয়ে আছে একটি তিরিশ বছর বয়সের যুবা পুরুষ-তার সমস্ত দেহে আঘাতের দাগ এবং তার মুখে-চোখে নিরাশা ও ক্রোধের চিহ্ন!

পূর্ণবাবু দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে বলে উঠলেন, ওর মুখে কাপড় ঢাকা দাও-দোহাই তোমাদের! ওর মুখে কাপড় ঢাকা দাও!

পৃথিবীতে প্রথম যে মানুষ অপূর্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসাদে রক্ত-মাংসে গড়া নিরেট দেহকে অদৃশ্য করবার অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে এমনি শোচনীয় ভাবে সে তার ভারবহ, ভীষণ জীবন সমাপ্ত করলে।

.

ষোড়শ । উপসংহার

বাবু বংশীবদন বসুকে তোমরা নিশ্চয়ই কেউ ভোলেনি।

তোমাদের কারুর যদি তার সঙ্গে দেখা করবার সাধ হয়, তাহলে চুপিচুপি পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে এসো। গোলমাল করলে তার দেখা পাবে না, কারণ তোমরা যে তাকে আগে থাকতে চেনেনা একথা টের পেলেই তিনি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারেন।

শ্রীপুরের পান্থনিবাস হোটেলে আমার সঙ্গে এসো। ওই দেখো, হোটেলের হল-ঘরের মাঝখানে, একখানা ইজিচেয়ারের উপরে পরম আয়েসে বসে বংশীবাবু কেমন মিষ্টি মিষ্টি হাসি হাসছেন! বংশীবাবু এখন দাঁতব্য জুতো ও ময়লা জামা-কাপড়কে অত্যন্ত ঘৃণা

করেন। তাঁর মাথায় এখন চমৎকার টেরি কাটা গায়ে ইস্ত্রি করা সিল্কের পাঞ্জাবি পরনে কোঁচানো শান্তিপুরি ধুতি ও পায়ে বার্নিশ করা চকচকে জুতো! আর, তোমরা শুনলে বোধ হয় অবাক হয়ে যাবে যে, এতবড় পান্থনিবাস হোটেলটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন, এখন কেবল তিনিই! পান্থনিবাসের এখন এমন পসার যে, শ্রীপুরের কোনও লোক স্বাস্থ্যনিবাসের নাম আর মুখেও আনে না।

এজন্যে বংশীবাবু বড়ই খুশি। যখন-তখন একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলেন, হুঁ হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফঁাদ তো দেখোনি! আমার ময়লা জামাকাপড় আর ছেঁড়া জুতো দেখে মিস্টার দাস ভারি তাচ্ছিল্য করেছিলেন। এখন বোধ হয় তিনি বংশীবদনের মহিমা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন!

তার হোটেলে বসে কেউ অদৃশ্য মানুষের নিন্দা করলে তিনি মুখভার করে বলেন, ওগো, তোমরা সবাই থামো! আমি গুরু-নিন্দা শুনব না! তোমরা যাঁকে অদৃশ্য মানুষ বলছ, তিনি ছিলেন আমার গুরুদেব! তার আশীর্বাদেই আজ আমার এত বাড়-বাড়ন্ত! বংশীবাবুর গুরুভক্তি দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। অদৃশ্য মানুষের হুকুমে শ্রীপুর ব্যাঙ্ক থেকে নোটপ্রজাপতিগুলো ফরফর করে উড়ে গিয়ে বংশীবাবুর পকেটে যে বাসা বেঁধেছিল, একথা কেউ না জানুক, তোমরা সকলে নিশ্চয় জানেনা। অতএব এসো, আমরাও সবাই মিলে বংশীবাবুর গুরুজির জয় দিয়ে পালা সাঙ্গ করি!